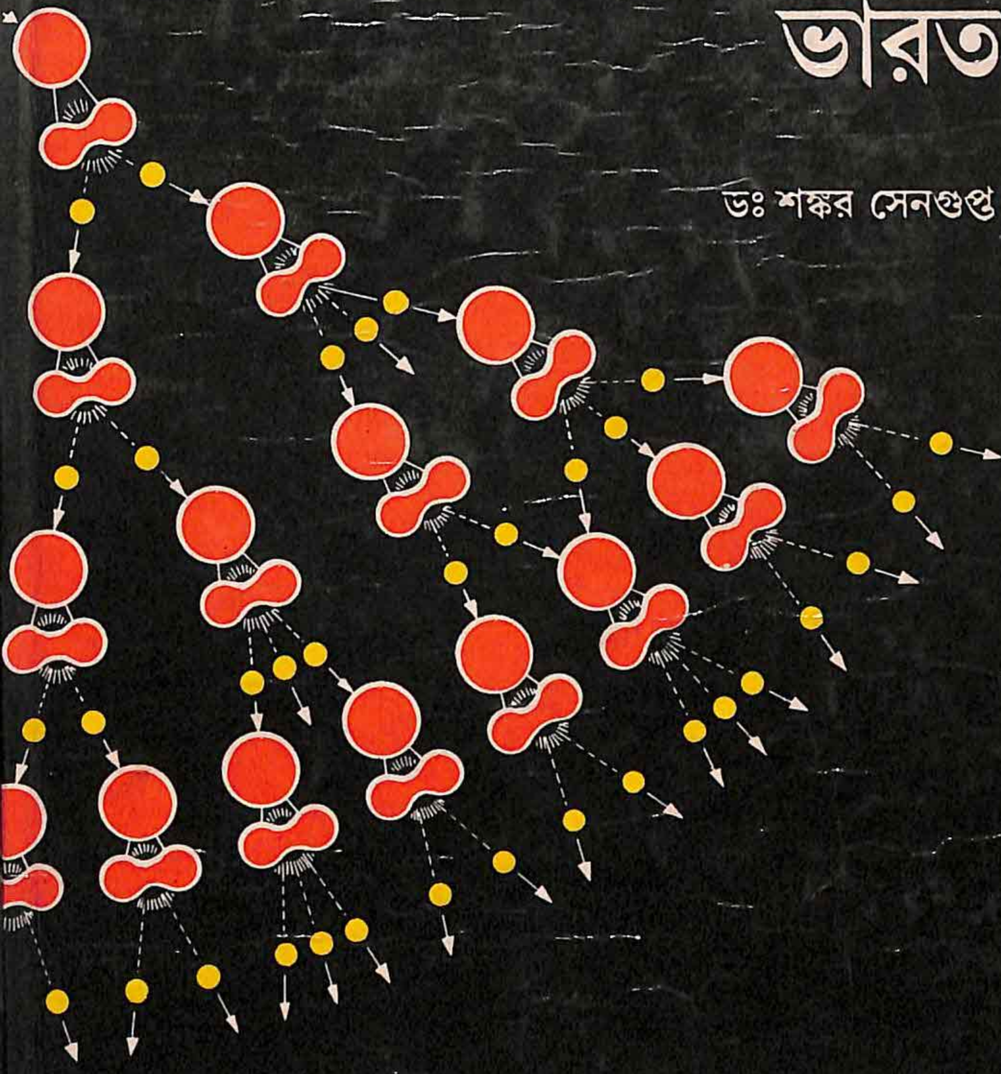
পরমাণুশক্তি ও ভারত



ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত

Appd for ISES
[illegible]
29/7/91

পরমাণুশক্তি ও ভারত

ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত

বেস্টবুক্‌স্
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

Paramanushakti-O-Bharat.
by Dr. Sankar Sengupta.

প্রথম প্রকাশ

১লা মে ১৯৯০

ISBN 81-85252-18-1

প্রকাশক
বেস্টবুকস্
১ এ কলেজ রো, কলিকাতা -৯

মুদ্রক
ওয়েলকম অ্যাসোসিয়েট্স
৭৮ বি, মনসাতলা লেন
কলিকাতা - ৭০০ ০২৩

মূল্য ২৫ টাকা

পরমাণুশক্তি ও ভারত

লেখকের কথা

কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসে যে শক্তি নিহিত আছে তাকেই আমরা কেন্দ্রীন শক্তি বলি। ব্যপক অর্থে এই হলো পরমাণু শক্তি। অন্যান্য পরিচিত শক্তির চেয়ে কেন্দ্রীন শক্তির একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। হিরোসিমা ও নাগাসাকির ঘটনাবলীর পর কেন্দ্রীন শক্তির ধ্বংসলীলার কথা ভেবে বিশ্বের মানুষ আজও শিউরে ওঠে। শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করলে কেন্দ্রীন শক্তির এক চেহারা। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করলে তা হয়ে ওঠে ভয়াবহ। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের তাগিদে মানুষ পরমাণুর কেন্দ্রীনে যে শক্তির সন্ধান পেয়েছে তা আজ বহু আলোচিত হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীন শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের চেষ্টা চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হচ্ছে পরমাণু অস্ত্র সম্ভার। এই বিতর্কিত শক্তির উৎসটি কি, কি ভাবে একে ব্যবহার করা হয়, এই শক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মতামত কি, কেন্দ্রীন শক্তিতে ভারতের ভূমিকা এবং সবশেষে এই শক্তির ব্যাপারে রাজনীতি, বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে – এই সব তথ্যই বর্তমান বই এর আখ্যান বস্তু॥

শঙ্কর সেনগুপ্ত

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা - ৭০০ ০৩২।

সূচীপত্র

ঃ আরও পড়ার জন্য ঃ

1 Nuclear arms race and the human race
— Rikhi Jaipal
— Allied Publishers Private Limited.

2 Nuclear India, Vol I & II
J. P. Jain
Padiant Publishers, New Delhi.

3 Nuclear Power Controversy
American Assembly Columbia University
Prentice Hall

4 Nuclear Power
James J. Dudenstadt.
Chihiro Kikuchi.
Ann Abhor, The University of Michigan Press.

5 Human and Ecological effects of nuclear
Power plants
Editors L. A. Sagan
Charles C. Thomas.

6 The Story of Atomic energy.
J. G. Feinberg.
Dover Publication.

7 The Atomic Adventure
Bertrand Goldschmidt.
Pergamon Press.

8 Nuclear India, Publication Officer
Department of Atomic Energy, Bombay.
The Annual Report of the Department of Atomic
Energy, Government of India.

১ শক্তি ও তার উৎস

নবযুগের সূচনা

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট আমেরিকার বি-২৯ বোমারু বিমান জাপানের জনবহুল, বর্ধিষ্ণু হিরোসিমা শহরের ওপরে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম পরমাণু বোমাটি ফেলল। শহরের মোট ৩,২০,০০০ জন অধিবাসীর প্রায় অর্ধেক মারা গেল, বাকী অর্ধেক রইল মৃতপ্রায় হয়ে। তেরো কিলোমিটার জায়গা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মোট ৯০,০০০ বাড়ীর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো। আরও তিনদিন পর দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটি নিক্ষিপ্ত হলো নাগাসাকি শহরের ওপর। এর ফলে আরও ৪০,০০০ হাজার মানুষের জীবনাবসান ঘটল আহত হলো অসংখ্য। এই বীভৎস ধ্বংসলীলা, মূল্যবান মানব জীবনের লজ্জাজনক ক্ষতি সারা পৃথিবীর মানুষের বিবেককে গভীর ভাবে নাড়া দিল। নিদারুণ বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি নতুন যুগের সূচনা হলো। এই নতুন যুগকে বলা হয় কেন্দ্রীন যুগ বা Nuclear era.

শক্তি

যদি কোন জিনিষ কিছু কাজ করতে সক্ষম হয় তবে ধরে নেওয়া হয় তার শক্তি আছে। বিভিন্ন ধরনের শক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত। সব জিনিষ বেড়ে ওঠার জন্য শক্তির দরকার। উদ্ভিদেরা সূর্যের আলো থেকে শক্তি পায়। তাপ এবং আলো শক্তির দুইরূপ। প্রাণীরা আহার্য হিসাবে অন্য উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের ব্যবহার করে। এই সব খাদ্যবস্তু প্রাণীদের রাসায়নিক শক্তি যোগায়। নানা কাজে তাপশক্তি দরকার হয়। এই তাপশক্তি আসে কয়লা বা গ্যাসীয় জ্বালানী থেকে। জ্বালানীর মধ্যে থাকে রাসায়নিক শক্তি। দহনের ফলে এই রাসায়নিক শক্তিই তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় (এক ধরনের শক্তিকে সব সময়ই অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়)। যখন কোন বস্তু চলমান তখন তার যা শক্তি তাকে আমরা গতিশক্তি বা Kinetic energy বলি। আরেক ধরণের শক্তি আছে যাকে আমরা বলি স্থিতি শক্তি বা Potential energy. এটা হলো সঞ্চিত শক্তির উদাহরণ। যখন আমরা ঘড়িতে দম দিই তখন চাবির গতিশক্তি স্প্রিং এর মধ্য দিয়ে স্থিতি শক্তি হিসাবে সঞ্চিত হয়ে যায়। স্প্রিংটি যতই খুলতে থাকে ততই এই স্থিতি শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। বাঁধের সাহায্যে যখন জল ধরে রাখা হয় তখন সেই জলের মধ্যে স্থিতি শক্তি সঞ্চিত থাকে। জলের এই স্থিতি শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। জলের স্থিতি শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত করে জেনারেটার সচল করা হয় তার থেকেই পাওয়া যায় বিদ্যুৎ।

শক্তির উৎস সমূহ

সভ্যতার অগ্রগতি যত হয়েছে ততই মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। আর তার

সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে নিত্য নতুন যন্ত্র। এই সব যন্ত্র চালাবার জন্য মানুষ রকমারি শক্তির উৎস সন্ধান করেছে। এরই তাগিদে সে হাত বাড়িয়েছে বাতাসের দিকে, জলস্রোতের দিকে, সূর্যালোকের দিকে। দৃষ্টি এসে পড়েছে কয়লা, তেল ও গ্যাসের মত জীবাশ্মঘটিত (fossil fuel) উৎসের দিকে। শক্তি অনুসন্ধানের শেষ পর্যায়ে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রীন শক্তি (Nuclear Energy)।

বাতাসের শক্তি

প্রায় ৯০০ খৃষ্টাব্দে শক্তির উৎস হিসাবে বাতাস চালিত কলের প্রচলন হয়। বাতাস সব সময় সমান গতিবেগে প্রবাহিত হয় না এবং বাতাসের শক্তি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত থাকে না। এর অর্থ হলো কয়লা বা অন্য কোন জ্বালানী ব্যবহার করলে আমরা তার শক্তি যেমন এক জায়গায় পাই বাতাসের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হবে না। বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট যন্ত্র বসাতে হবে। এই সব ছোট ছোট যন্ত্র বসাতে ও সচল রাখতে যে খরচ হবে তার তুলনায় শক্তির উৎপাদন হবে অনেক কম। বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে এমন একটি যন্ত্র হলো wind mill বা হাওয়া কল। গত শতাব্দির শেষের দিক পর্যন্ত শস্য ভাঙ্গার বা সেচের জমিতে জল দেওয়ার কাজে হাওয়া কল ব্যবহার করা হতো। হল্যাণ্ডে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। হাওয়া কল চালিয়ে ও তার সাহায্যে টারবাইন ঘুড়িয়ে অল্প মাত্রায় বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে ব্যাটারি চার্জ করা যায়। আমাদের দেশে বিশেষত হিমালয় অঞ্চলে এমন সব জায়গা আছে যেখানে হাওয়া সময় সময় এত জোরে বয় যে সেখানে হাওয়া কল বসালে হয়ত বেশ কিছু পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে। তবে হাওয়া কল প্রযুক্তি বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা ও জলস্রোতের শক্তি

সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি আত্মগোপন করে আছে তাকে ব্যবহার করা বা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। কোন কোন জায়গায় অবশ্য এই জলোচ্ছ্বাসকে কাজে লাগিয়ে বড় বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এ ধরণের এক একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা প্রচুর ব্যয়সাধ্য। এইজন্য সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা কে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা খুব একটা জনপ্রিয় বলে চিহ্নিত হয় নি। বা-তাসের মতই সমুদ্রজলের শক্তি এত বড় জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এবং তা এতই পরিবর্তনশীল যে ব্যাপক হারে তাকে কাজে লাগানো খুব একটা সম্ভব হচ্ছে না।

সৌরশক্তি

উদ্ভিদ জগতের মাধ্যমেই আমরা সৌরশক্তি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি। খাদ্য উৎপাদনের জন্য চাষ বাস আমরা যা-করে থাকি তা মূলতঃ সৌরশক্তির ওপরেই নির্ভর। শিল্পের ক্ষেত্রে সৌরশক্তির ব্যবহার খুব বেশি একটা সম্ভব হয়নি। এর কারণ হলো সূর্য থেকে আমরা যে শক্তি পাই তা খুব সুসংহত ভাবে আসে না। সৌরশক্তি বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে এবং এই শক্তি কেবল দিনের বেলাতেই পাওয়া সম্ভব। আজকাল সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য নানারকমের উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। পশ্চিমী দেশগুলির বহু জায়গায় বাড়ি গরম রাখার কাজে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হয়। এই সঙ্গে আবার সূর্যরশ্মির সাহায্যে

জল গরম করা বা রান্না করার ব্যবস্থা আছে। ভারতের জাতীয় ভৌত গবেষণাগারে (National Physical Laboratory) সুবিধামত অবতল ফলক (Concave reflector) ব্যবহার করে সূর্যরশ্মির সাহায্যে রান্না করার একটি সরল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ কোষ বা সৌর কোষ (Solar battery) নির্মিত হয়েছে। তিরিশ বছর আগেও সৌর কোষের ব্যবহার তেমন ছিল না কিন্তু বর্তমানে মহাকাশ যান গুলিতে এই ধরণের সৌরকোষ বিপুল ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেতার যন্ত্রে, আলোক স্তম্ভে, দূরবর্তী স্থানে আবহাওয়ার খবর পাঠাবার ব্যাপারে এবং আর যেসব যন্ত্রে কম তড়িতের প্রয়োজন সেসব যন্ত্রে সৌর কোষের ব্যবহার বেড়েছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যখন অন্যান্য সকল শক্তির উৎস ফুরিয়ে যাবে তখন অফুরন্ত সৌরশক্তিই শক্তির মুখ্য উৎস হিসাবে পরিগণিত হবে।

নদীর স্রোত ও তার শক্তি

নদীর স্রোতের শক্তি বলতে আমরা তার জলস্রোতের গতিশক্তিকেই (kinetic energy) বুঝি।

এই শক্তি নির্ভর করে প্রবাহের তীব্রতা ও নিত্যতার ওপর। নদীর প্রবাহের তীব্রতা যথোপযুক্ত হলেই এই উৎস থেকে তড়িৎ উৎপন্ন করে তাকে কিছু দূর পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া যায়। যখন নদীর স্রোতের এই দুটি গুণ বর্তমান না থাকে তখন বাঁধের সাহায্যে জলকে ধরে রেখে এর গতিশক্তিকে স্থিতি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। নদীমাতৃক হওয়াতে এই ধরনের শক্তি উৎপাদন ভারতের পক্ষে খুব উপযোগী। ভারত প্রায় ৪০ মিলিয়ন কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ তৈরি করতে সক্ষম। ইতিমধ্যেই ভারতে ছোট বড় মিলিয়ে অনেক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে অনেক। একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করতে খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হলেও প্রকল্পটি চালু রাখতে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের চেয়ে কম খরচ লাগে। পরিশ্রম, সূক্ষ্ম কৌশল ও ভালো জিনিষ দিয়ে একবার একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করতে পারলে তা শক্তির একটি অফুরান উৎস হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। ভারতবর্ষের যা শক্তির প্রয়োজন তার প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ জলবিদ্যুৎ থেকে আসে। আগামী দিনে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প শক্তির ব্যাপারে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বাভাবিক ভাবেই যেখানে নদী বা বৃষ্টির প্রাচুর্য নেই সেখানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোন উদ্দেশ্যই সাধন করতে পারবে না। ইংল্যান্ডে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বেশী নেই যদিও সেখানেই প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হয় ১৮৯৬ সালে। এতদিন তাকে কয়লার ওপর নির্ভরশীল তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। কয়লার পরিমাণ দ্রুত শেষ হয়ে যাবার দরুণ তাকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে নব আবিষ্কৃত কেন্দ্রীন শক্তির দিকে।

জীবাশ্মঘটিত শক্তির উৎস

জীবাশ্মঘটিত শক্তির উৎসের মধ্যে কয়লা অন্যতম। যদিও পৃথিবীর কোন কোন অংশে জলবিদ্যুৎকে শক্তির উৎস হিসাবে কাজে লাগানো হয় তবুও শক্তির প্রধান-উৎস হিসাবে কয়লার ব্যবহারই সমধিক। তেল বা গ্যাস অনেকখানি শক্তি দিলেও মানুষের ব্যবহৃত শক্তির বেশীর ভাগই আসে কয়লা থেকে। কয়লা জ্বালালে প্রচুর পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়। এই তাপ জলকে বাষ্পে পরিণত করে বিদ্যুৎ সৃষ্টিকারী টারবাইনকে ঘোরায়।

তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যপ্রণালীটি মোটামুটি সরল। এর জন্য বড় বাঁধের দরকার নেই, বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে তাকিয়েও থাকতে হয় না। ভারতে পর্যাপ্ত কয়লা সঞ্চিত আছে যা বেশ কয়েক যুগ ধরে শক্তি যোগাবে। যেসব জায়গায় জলবিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে তাপবিদ্যুৎই শক্তির একমাত্র উৎস। ভারতে বহু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে আর প্রয়োজনীয় শক্তির প্রায় ষাট শতাংশ এখান থেকে পাওয়া যায়। এখন সাড়া দেশ জুড়ে চেষ্টা চলছে জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎকে সংযুক্ত করে প্রকল্প স্থাপন করার। এতে স্থানীয় প্রকল্পগুলিকে সর্বভারতীয় স্তরে সংযুক্ত করা যেতে পারে। জলবিদ্যুৎ সংগ্রহের চেষ্টা বাড়তে থাকলেও তাপশক্তি ও কেন্দ্রীনশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে যাতে জাতীয় জীবনে তারা আরও বড় ভূমিকা নিতে পারে। যখন কয়লা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন কেন্দ্রীন শক্তিই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে – তখন বাকী দুটির ভূমিকা হয়ে যাবে গৌণ।

ওপরের আলোচনায় যখনই শক্তির কথা বলা হয়েছে তখন মূলতঃ বিদ্যুৎ শক্তিই বোঝান হয়েছে। বর্তমানে আমরা প্রায় ১৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করি। এটি আমাদের মোট চাহিদার সামান্যই। কিছু পরিমাণ শক্তি আমরা আহরণ করি গ্রামাঞ্চলের বনজ সম্পদ ও অন্যান্য উৎস থেকে। এতে অবশ্য বনজ সম্পদ কমে গিয়ে অন্য ধরণের বিপদ ডেকে আনে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে বনসম্পদ বাঁচানো আমাদের অন্যতম কর্তব্য। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে আমরা কতটা পেছিয়ে আছি তা বোঝা যায় একটা সহজ হিসাব থেকে। আমেরিকায় প্রতিটি মানুষের মাথা পিছু বিদ্যুৎ খরচ আমাদের চেয়ে ৫০ গুণ বেশী।

কেন্দ্রীন শক্তি

বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতে কেন্দ্রীন শক্তি তার আপন স্থান করে নিয়েছে। কয়লার মত এত বিরাট পরিমাণ না হলেও কেন্দ্রীন জ্বালানী – ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম – আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। কয়েক হাজার টন কয়লা, তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত আছে প্রতিগ্রাম ইউরেনিয়ামে প্রায় সেই পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, যে পরিমাণ কেন্দ্রীন জ্বালানী আমাদের মজুত আছে তার থেকে যা শক্তি পাওয়া যাবে তা প্রচলিত অন্যান্য জ্বালানী থেকে যে শক্তি পাওয়া যাবে তার পনের গুণ বেশী। এই সুবিধার জন্য কেন্দ্রীন শক্তি আগামী কয়েক দশকের মধ্যে শক্তির মুখ্য উৎস হয়ে দাঁড়াবে। কেন্দ্রীন শক্তির প্রভাব আজ প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়েই অনুভূত হচ্ছে। ১৯৫৬ সালে ব্রিটেনে পুরোপুরি ভাবে কেন্দ্রীনশক্তি থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার প্রকল্পটি চালু হয়। ১৯৭৫ সালের মধ্যে সেখানে এ ধরণের আরও কয়েকটি প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া কেন্দ্রীন শক্তিতে সবচেয়ে বেশী বলীয়ান্। ফ্রান্স ও চীন আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কেন্দ্রীন শক্তি পরিচালিত সাবমেরিণ, ব্যবসায়ী জাহাজ চালু হয়ে গিয়েছে। হয়ত অচিরেই আমরা দেখতে পাব যে কেন্দ্রীন শক্তি পরিচালিত বিমান আকাশে উড়ছে। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নতশীল দেশগুলিও আজকাল আর পিছিয়ে নেই। তাদের জাতীয় আয়ের বেশ বড় একটা অংশ কেন্দ্রীন সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ধরণের প্রচেষ্টায় ভারতও আজ সামিল। বস্তুতঃ কেন্দ্রীন বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি অন্যান্য উন্নতশীল দেশগুলিরই নয় পশ্চিমী দেশগুলিরও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত আজ তার নিজস্ব জিনিষপত্র দিয়ে কেন্দ্রীন রিয়াক্টার তৈরী করতে পারে। শুধু তাই নয় ইচ্ছে করলে সে পরমাণু বোমা তৈরী করতেও সক্ষম। চতুর্থ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে কেন্দ্রীনশক্তি থেকে পাওয়া বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০০০ মেগাওয়াট। ভারতের পরমাণুশক্তি কমিশন দশ বছরের একটি কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে অতি সামান্য ও অদৃশ্য পরমাণুর কেন্দ্রীনে কি এক বিরাট শক্তির উৎস আত্মগোপন করে আছে। সর্বত্রই পরমাণু ছড়িয়ে আছে। যা কিছু আমরা দেখতে পাই তাই-ই পরমাণু দিয়ে তৈরী।

পরমাণুর আকৃতি

একটি পরমাণুর আকৃতি অনুমান করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। ১০০,০০০,০০০ টি পরমাণুকে পাশাপাশি রাখলে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, তার পারিমাণ দাঁড়াবে **প্রায়** এক সেন্টিমিটার। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যত মানুষ আছে একটি শস্য দানার মধ্যে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক পরমাণু আছে। এক ফোঁটা জলে প্রায় ৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টি পরমাণু আছে। যদি পরমাণু দিয়ে তৈরী ২৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি মালা কারুর বিংশতিতম জন্মদিনে উপহার দেওয়া হয় তাহলে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে পরমাণু গুণতে আরম্ভ করলে তার একশোতম বছরে গোনার কাজ শেষ হবে।

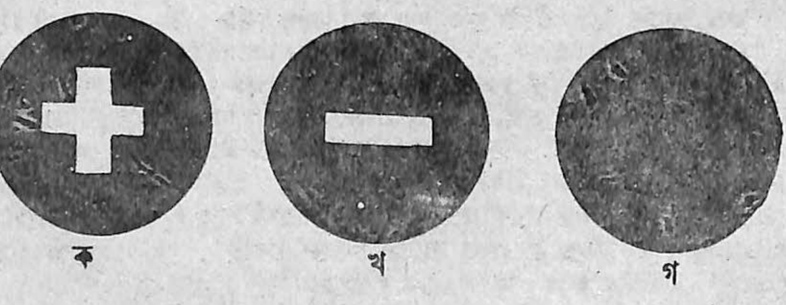
পরমাণুর পিতা

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পরমাণুর স্থায়িত্ব বর্তমান। কিন্তু পরমাণুর কথা প্রথম ভাবেন ও বলেন খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬৫ বছর আগে গ্রীক দার্শনিক ডেমেক্রিটাস। এজন্য তাঁকে পরমাণুর পিতা বলা হয়। ভারতীয় দার্শনিক কণাদত্ত পরমাণুর অস্তিত্বের কথা বলেন।

এর প্রায় ২,০০০ বছর পর পর্যন্ত মানুষ পরমাণুর কথা বিশেষ চিন্তা করে নি। ১৮০৮ সালে বিজ্ঞানী ডালটন তাঁর বিখ্যাত পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ডালটনের পরমাণু তখনও পর্যন্ত অবিভাজ্য ছিল। একশ বছর পরে ১৯০৩ সালে রাদারফোর্ড ও তার সঙ্গীরা প্রমাণ করলেন যে পরমাণুকে ভাঙ্গা যায়। এ ছাড়া তাঁরা প্রমাণ করলেন যে পরমাণু পরিবর্তনশীল, তেজস্ক্রিয়তা বা radioactivity এরকম একটি পরিবর্তনের নিদর্শন।

পরমাণু ছোট একটি সৌরমণ্ডল

পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পরমাণু তিনটি মৌলিক কনা দিয়ে তৈরি। এই তিনটি কণা হলো প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। প্রোটন এক একক ধনাত্মক তড়িতাধান (positive charge), ইলেকট্রন এক একক ঋণাত্মক তড়িতাধান (negative charge) বহন করে। নিউট্রন নিস্তড়িত। প্রোটন ও নিউট্রন এর ভর প্রায় সমান এবং এরা প্রত্যেকে ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে ১৮৪০ গুণ ভারী।



১ পরমাণুর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কণা ক – প্রোটন খ – ইলেকট্রন গ – নিউট্রন

পরমাণুর গঠনের সঙ্গে সৌরমণ্ডলীর সাদৃশ্য আছে। যেমন সৌরমণ্ডলীর মাঝখানে থাকে সূর্য তেমনি পরমাণুর মাঝখানে একটি অংশ থাকে তাকে বলা হয় কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস। কেন্দ্রীনের ভেতরে সংঘবদ্ধ ভাবে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। সূর্যের চারিপাশে বিভিন্ন গ্রহেরা যেমন নিজেদের কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় ঠিক তেমনি ভাবে কেন্দ্রীনের চারিপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনেরা ঘুরে বেড়ায়। সৌরমণ্ডলীতে যেমন সূর্য অন্যান্য গ্রহদের তুলনায় অনেক ভারী তেমনি পরমাণুর বেলাতে কেন্দ্রীনই হলো সবচেয়ে ভারী অংশ। প্রোটন নিউট্রনের তুলনায় ইলেকট্রনদের ভর নগণ্য ধরা হয়। সুতরাং পরমাণুর ভর বলতে নিউট্রন ও প্রোটনের সম্মিলিত ভরকেই বুঝি।

পারমানবিক সংখ্যা (mass number)

পারমাণবিক সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি কেন্দ্রীনে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টি।

পারমাণবিক ভর (Atomic weight)

পারমাণবিক ভর একটি সংখ্যা যার দ্বারা বোঝা যায় একটি পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অথবা একটি অক্সিজেন পরমাণুর ১/১৬ অংশ অথবা একটি কার্বন পরমাণুর ১/১২ অংশের চেয়ে কতগুণ ভারী। এই সংখ্যাকে যখন কোন একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন তা পরমাণুটির ওজন নির্দ্দেশ করে। যেহেতু ইলেকট্রনরা অত্যন্ত হালকা তাই পরমাণুর ওজনের জন্য মূলত দায়ী কেন্দ্রীনে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনেরা।

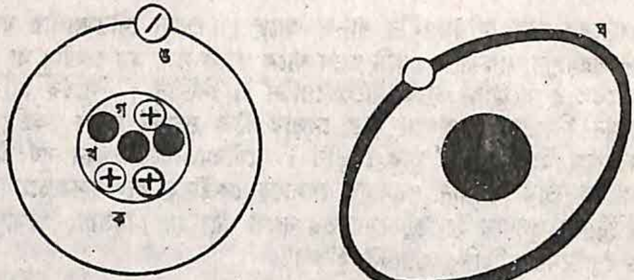
পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number)

পারমাণবিক সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি একটি পরমাণুর কেন্দ্রীনে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা। সাংকেতিক ভাবে কোন মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রীনকে লেখা হয় Z^{X^A}, এখানে X হলো মৌলটির সাংকেতিক চিহ্ন। Z পারমাণবিক সংখ্যা ও A ভর সংখ্যা। সুতরাং (A—Z) একটি কেন্দ্রীনে অবস্থিত নিউট্রন সংখ্যা। যেমন $৯২^{U^{২৩৫}}$। এখানে পারমাণবিক সংখ্যা ৯২ এবং ভরসংখ্যা ২৩৫ সুতরাং নিউট্রনের সংখ্যা ২৩৫-৯২ = ১৪৩

আইসোটোপ (Isotope)

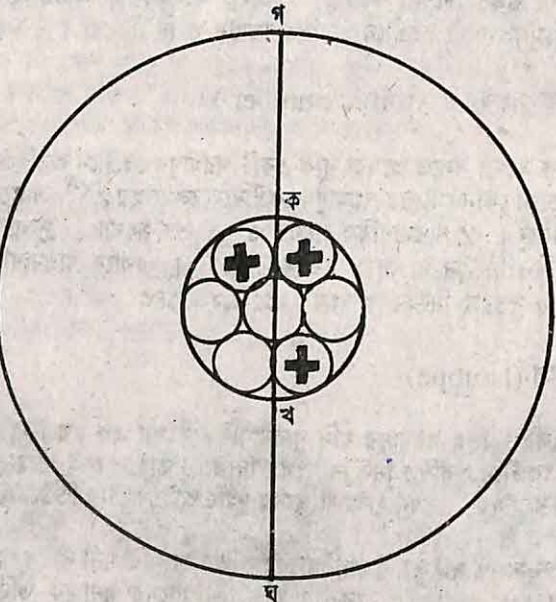
একই মৌলের বিভিন্ন পরমাণুর যদি পারমাণবিক সংখ্যা এক হয় কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা হয় (অর্থাৎ কেন্দ্রীনে অবস্থিত নিউট্রন সংখ্যা বিভিন্ন) তাহলে সেই পরমানু গুলিকে ঐ মৌলের আইসোটোপ বলা হয়। যেমন হাইড্রোজেনের দুইটি আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম $_{১}H^{২}$, ট্রিটিয়াম $_{১}H^{৩}$।

পরমাণু গঠন সম্বন্ধে সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব ডাচ্ বিজ্ঞানী নীলস্ বোরের। তাঁর তত্ত্বটি প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক তড়িতাধানের আকর্ষণে ইলেকট্রনগুলি আটকে থাকে যেমন ভাবে সূর্যের আকর্ষণে আটকে থাকে গ্রহেরা। ইলেকট্রন প্রতি সেকেন্ডে সাত মিলিয়ন বিলিয়ন বার কেন্দ্রীনের চারিপাশে ঘোরে। এ ধরণের এক অবিশ্বাস্য গতিবেগে ঘোরার জন্য ইলেকট্রনরা কেন্দ্রীনের চারিপাশে তড়িতাধানের ঘন আস্তরণ রচনা করে। বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডগুলি খুব জোরে ঘুরলে যেমন মনে হয় একটি চাকতি তৈরী হয়েছে।



২ পরমাণুর আকৃতি
ক–কেন্দ্রীন, খ–প্রোটন, গ–নিউট্রন, ঘ–কক্ষপথ, ঙ–ইলেকট্রন

সূর্য এবং গ্রহদের মধ্যে যেমন বিরাট শূন্যতা বিরাজ করে ঠিক তেমনি ভাবে কেন্দ্রীন থেকে ইলেকট্রনেরা অনেক দূরে অবস্থান করে। কেন্দ্রীন ও পরমাণুর ব্যাসার্দ্ধের অনুপাত হলো ১ : ১০,০০০ থেকে ১০০,০০০। এর থেকেই বোঝা যায় যে পরমাণুর মধ্যে কি বিরাট এক শূন্যতা আছে।



৩ পরমাণুর মধ্যেকার শূন্যতা.
ক-খ তুলনায় গ-ঘ – ১১০০০,০০০,০০০,০০০ – ১১,১০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুণ বড়

হিসেব করে দেখা গেছে কেন্দ্রীন তার পরমাণুর ১/১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ থেকে ১/১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ অংশ অধিকার করে। এর অর্থ হলো ১,০০০,০০০,০০০,০০০ থেকে

১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক কেন্দ্রীন দরকার হবে যদি পরমাণুটিকে শুধু কেন্দ্রীন দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। আমরা যদি দেহের সকল কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনগুলি এক জায়গায় করি তবে তার আকার এক ধূলিকণার চেয়ে বড় হবে না।

বিভিন্ন ধরনের পরমাণু

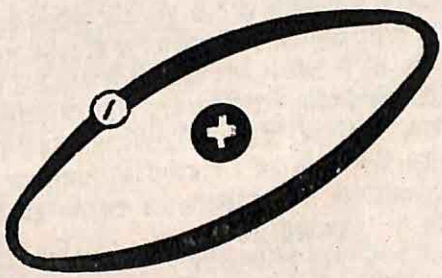
মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে বিরানব্বইটি মৌলিক বস্তু আছে। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন সবচেয়ে হাল্কা এবং ইউরেনিয়াম সবচেয়ে ভারী। প্রত্যেকটি মৌলিক বস্তুর পরমাণুর গঠন বিভিন্ন অর্থাৎ এদের মধ্যেকার নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন। প্রত্যেকটি পরমাণুর ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন সংখ্যা কেন্দ্রীনে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যার সমান। এর ফলে প্রত্যেকটি পরমাণু নিস্তড়িত।

ইলেকট্রনকক্ষ

ইলেকট্রনগুলি যে পথে কেন্দ্রীনের চারিপাশে ঘোরে তাকে বলা হয় ইলেকট্রন কক্ষ। কক্ষের সংখ্যা এক থেকে সাত পর্যন্ত হতে পারে। পরমাণু বিজ্ঞানে এই কক্ষদের নাম দেওয়া হয় যথাক্রমে K, L, M, N, O, P, ও Q কক্ষ। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামে একটি করে ইলেকট্রন কক্ষ আছে। কার্বন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনে দুটি করে। সোডিয়াম ও ক্লোরিনে তিনটি, সোনা, পারদ ও সীসায় ছটি করে, রেডিয়াম ও ইউরেনিয়ামে সাতটি ইলেকট্রন কক্ষ আছে। যাদের একেবারে বাইরের কক্ষে দুটি বা আটটি ইলেকট্রন অবস্থিত তারা সুস্থিত বা নিস্ক্রিয় অর্থাৎ এরা সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না।

হাইড্রোজেন পরমাণু

সাধারণ হাইড্রোজেন হলো এমন একটি পরমাণু যার কেন্দ্রীনে কোন নিউট্রন নেই। হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন ও তার চারিপাশে একটি ইলেকট্রন ঘুরছে।

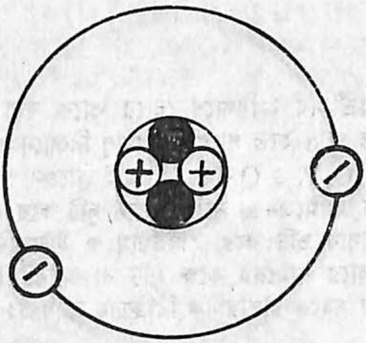


৪ সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু
কেন্দ্রীনে একটি মাত্র প্রোটন ও কোন নিউট্রন নেই।

আরও দুধরণের হাইড্রোজেন আছে। এরা হলো ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম। এদেরকে বলা হয় ভারী হাইড্রোজেন। প্রথমটির কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন আছে। দ্বিতীয়টির কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন দুটি নিউট্রন। এরা দুটি হলো সাধারণ হাইড্রোজেনের আইসোটাপ।

হিলিয়াম পরমাণু

সূর্যের অভ্যন্তরে হিলিয়াম পরমাণু নিরন্তর সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কয়েক মিলিয়ান ডিগ্রি উষ্ণতায় হাল্কা হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন সংযুক্ত হয়েই হিলিয়াম তৈরি হয় ও প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। হাইড্রোজেনের পরে হিলিয়ামই হলো সবচেয়ে হাল্কা। হিলিয়াম কেন্দ্রীনে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আছে। প্রথম অর্থাৎ K কক্ষে দুটি ইলেকট্রন আছে। সুতরাং এটি একটি সুস্থিত পরমাণু, হিলিয়াম জ্বলনশীল নয়।



৫ হিলিয়াম পরমাণু, কেন্দ্রীনে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আছে

ইউরেনিয়াম পরমাণু

ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনে ৯২ টি প্রোটন ও ১৪৬ টি নিউট্রন থাকে। বিভিন্ন ইলেকট্রন কক্ষে ইলেকট্রনের সংখ্যা ৯২ টি। প্রকৃতিতে আর ও দুটি ইউরেনিয়াম আইসোটোপ পাওয়া যায় $_{৯২}U^{২৩৪}$ ও $_{৯২}U^{২৩৫}$। অর্থাৎ এদুটিতে প্রোটন সংখ্যা ও ইলেকট্রন সংখ্যা ৯২ করে এবং নিউট্রন সংখ্যা প্রথমটিতে ২৩৪–৯২ = ১৪২। আর দ্বিতীয়টিতে ২৩৫–৯২ = ১৪৩।

আমরা জানি দুটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন সংযোজিত হয়ে হিলিয়াম তৈরি হয় ও প্রচুর শক্তি নির্গত করে। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্রভৃতি আইসোটোপের বেলায় দেখা গেছে এর কেন্দ্রীন বিভাজন ঘটলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। পারমাণবিক বোমার যে শক্তি তার উৎসই হলো এই প্রক্রিয়া। ইউরেনিয়ামের সব আইসোটোপের ক্ষেত্রেই ৯২ টি ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন কক্ষপথে। সবচেয়ে ভেতরে এবং সবচেয়ে বাইরের কক্ষে দুটি করে ইলেকট্রন আছে।

ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপের মধ্যে কেবল $_{৯২}U^{২৩৫}$ এরই কেন্দ্রীন বিভাজন (Fision) ঘটান যায়। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপগুলি মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সুতরাং $_{৯২}U^{২৩৫}$ এই মিশ্রণ থেকে আলাদা করে নিতে হবে। এই আলাদা করার ব্যাপারটা

ব্যয়সাধ্য ও খুবই জটিল। কয়েকটি অগ্রসর দেশই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত। প্রকৃতিতে যে পরিমাণ মিশ্রিত ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তার মধ্যে $_{৯২}U^{২৩৫}$ খুব কম পরিমাণে (০·৭%) থাকে। বেশীর ভাগটাই হলো $_{৯২}U^{২৩৮}$। এই মুল্যবান আইসোটোপটি পেতে গেলে আমাদের বিরাট পরিমাণ প্রকৃতির ইউরেনিয়াম পাওয়া দরকার। রাসায়নিক ভাবে এই আইসোটোপ আলাদা করা মুশকিল কেননা আইসোটোপগুলির রাসায়নিক চরিত্রগুলি এক। আইসোটোপদের ঘনত্বের ভিন্নতার ওপর নির্ভর করে এদের আলাদা করা সম্ভব কিন্তু এই আইসোটোপদের বেলাতে এই ভিন্নতা এত কম যে আলাদা করাটা জটিল হয়ে পড়ে। তবুও বোমা তৈরির কাজে বা রিয়েক্টারে যে পরিমাণ আইসোটোপ লাগে তা ওপরের পদ্ধতিতেই আলাদা করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় গ্যাসীয় ব্যাপন বা Diffusion। এই প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত ইউরেনিয়ামকে গ্যাসে পরিণত করা হয়। এই গ্যাসে দু-ধরনের পরমাণু থাকে। এক ভারী $_{৯২}U^{২৩৮}$ ও অপেক্ষাকৃত হাল্কা $_{৯২}U^{২৩৫}$। এই মিশ্রিত গ্যাসকে অসংখ্য ছিদ্র যুক্ত একটি আধারে রাখা হয়। এই ছিদ্র গুলি এতই ছোট যে খুব ধীর গতিতে ডিফিউশন পদ্ধতি ছাড়া অনুগুলি দেওয়ালের ওপারে যেতে পারে না। $_{৯২}U^{২৩৫}$ আইসোটোপের অণুগুলি ভারী আইসোটোপ $_{৯২}U^{২৩৮}$ এর অণুদের চেয়ে তাড়াতাড়ি ডিফিউশান হয়। সুতরাং একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারী আইসোটোপের অণুর চেয়ে হাল্কা আইসোটোপের অণু বেশী বেড়িয়ে আসে। পরপর কয়েকটি আধারের মধ্য দিয়ে ডিফিউশন করিয়ে খুব বিশুদ্ধ $_{৯২}U^{২৩৫}$ পাওয়া যায়।

পরমাণু থেকে শক্তি

পরমাণুর মধ্যে দুই ধরনের শক্তির বিরাট উৎস আত্মগোপন করে আছে। এরা হলো রাসায়নিক ও কেন্দ্রীনশক্তি। রাসায়নিক শক্তি নিহিত আছে ইলেকট্রনদের মধ্যে আর কেন্দ্রীন শক্তি নিহিত আছে কেন্দ্রীনের মধ্যে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তি আত্মপ্রকাশ করে, কেন্দ্রীন শক্তি বিকাশ পায় কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায়। পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে বাইরের কক্ষে যে ইলেকট্রনেরা আছে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাদের বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরমাণুরা ইলেকট্রন গ্রহণ অথবা বর্জন করে। রাসায়নিক বিক্রিয়াতে কেন্দ্রীনের কোন ভূমিকা নেই। কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় পরমাণুর কেন্দ্রীনের পরিবর্তন ঘটে। বহুভাবেই কেন্দ্রীনের এই পরিবর্তন আনা সম্ভব। ভারী ও অসুস্থিত কেন্দ্রীন ভেঙ্গে হাল্কা সুস্থিত কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে কিংবা হাল্কা সুস্থিত কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে ভারী সুস্থিত কেন্দ্রীন তৈরি হতে পারে। এই সব প্রক্রিয়াতে যে শক্তি বেড়িয়ে আসে তা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বেড়িয়ে আসা শক্তির তুলনায় কয়েক মিলিয়ান গুণ বেশী। কয়লা বা তেল পুড়িয়ে আমরা যে শক্তি পাই তা হলো রাসায়নিক শক্তির উদাহরণ। অপর দিকে পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং রিয়াক্টার থেকে যে শক্তি পাই তা হলো কেন্দ্রীন শক্তি।

কোন বল কেন্দ্রীনকে সংহত রাখে

একমাত্র হাইড্রোজেন ছাড়া আর সব পরমাণুতে একাধিক ইলেকট্রন এবং সেই সংখ্যক প্রোটন আছে। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হলো ৯২। কেন্দ্রীনে অবস্থিত প্রোটন গুলি ধনাত্মক তড়িতাধান যুক্ত হওয়াতে পরস্পর বিকর্ষণ করার কথা। ভারী পরমাণুতে যেখানে কেন্দ্রীনের প্রোটনের সংখ্যা বেশী সেখানে এই বিকর্ষণ খুব বেশী এবং আশা করা যেতে পারে যে বিকর্ষণের ফলে কণাগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা এ রকমটি ঘটতে

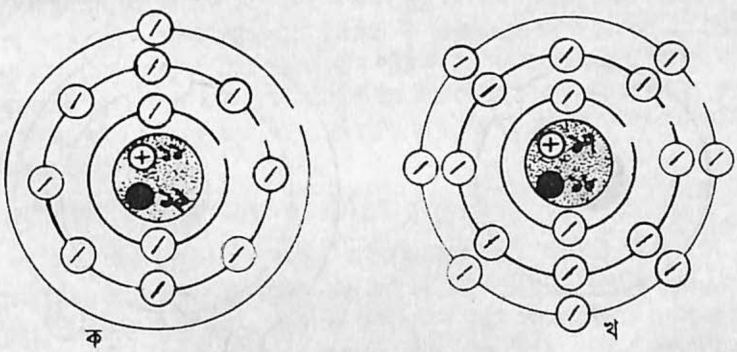
দেখি না। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে কি ধরনের বল কেন্দ্রীনে প্রোটনদের সংহত করে রেখেছে। আমরা জানি কেন্দ্রীনের মধ্যে প্রোটন ছাড়া নিউট্রনরাও উপস্থিত, সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে প্রোটনের মধ্যেকার বিকর্ষণ বলের চেয়ে আরও বেশী শক্তিশালী আকর্ষক বল নিশ্চয়ই প্রোটন ও নিউট্রনদের মধ্যে বিরাজ করছে। এই আকর্ষক বলের চরিত্রটি আজও পুরোপুরি বোঝা যায় নি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাই মেসন (π) নামে একটি কণা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই আকর্ষক বলের একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। এই নতুন কণাটি খুবই ছোট। নিউট্রন বা প্রোটনদের চেয়ে কম ভারী কিন্তু ইলেকট্রনের চেয়ে ২৭০ গুন ভারী। π মেসন ধনাত্মক বা ঋনাত্মক তড়িতাধান যুক্ত কিংবা নিস্তড়িত হতে পারে। এরা খুবই ক্ষণস্থায়ী, প্রোটন এবং নিউট্রন অতি দ্রুতহারে π মেসন গ্রহন ও বর্জন করে। প্রোটন ধনাত্মক π মেসন ছেড়ে নিস্তড়িত নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়। আবার নিউট্রন সেটি গ্রহণ করে প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে π মেসনের এত দ্রুত আদান প্রদান তাদের মধ্যে এক শক্তিশালী আকর্ষক বলের সৃষ্টি করে।

৩ কেন্দ্রীন বিক্রিয়া

প্রকৃতিতে যে বিরানব্বইটি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায় তাদের পারমাণবিক সংখ্যা ১ থেকে ৯২। পরমাণুতে যে কয়টি প্রোটন আছে সেটাই পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা। পারমাণবিক সংখ্যা ৯২ চেয়ে বেশী এমন পরমাণু প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যায় না। কৃত্রিম ভাবে অবশ্য কিছু পরমাণু তৈরি করা যায় যাদের পারমাণবিক সংখ্যা ৯২র চেয়ে বেশী। এই সব পরমাণুকে বলা হয় ট্রান্স ইউরেমিক মৌলবস্তু এবং পর্যায় সারণীতে (Periodic table) এরা ইউরেনিয়ামের পরে আসে। ৯২ টি মৌলিক বস্তু মানে ৯২ টি বিভিন্ন পরমাণু। একমাত্র হিলিয়াম ছাড়া অন্য পরমাণুরা বাইরের কক্ষে সর্বাধিক আটটি পর্যন্ত ইলেকট্রন ধরে রাখতে পারে। যেসব পরমাণুর বাইরের কক্ষে আটটি করে ইলেকট্রন আছে তারা নিস্ক্রিয় হয়। আরগন, নিয়ন, জিনন, ক্রিপটন প্রভৃতি পরমাণুর বাইরের কক্ষে আটটি করে ইলেকট্রন আছে, এজন্য এদেরকে বলা হয় নিস্ক্রিয় গ্যাস। একমাত্র হিলিয়াম গ্যাসে একটি কক্ষ আছে এবং সেখানে দুটি ইলেকট্রন থাকে। হিলিয়াম গ্যাসও সহজে বিক্রিয়াতে অংশ নেয় না। অপরদিকে যে সব পরমাণুদের বাইরের কক্ষে আটটি করে ইলেকট্রন নেই সেইসব পরমাণুরা সুযোগ পেলেই বাইরের কক্ষে আটটি ইলেকট্রন ধরে রাখার চেষ্টা করে। এই জন্য তারা হয় ইলেকট্রন বর্জন করে বা অন্য পরমাণু থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে। এই আদান প্রদানের ফলেই উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে একটি যৌগ উৎপন্ন হয়। এই ইলেকট্রন আদান প্রদান দুই উপায়ে হয়ে থাকে ১. একটা পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে (তড়িৎ যোজ্যতা বা electro valency) ২. বিক্রিয়ায় পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর ইলেকট্রন বিনিময় বা ভাগাভাগি করে (সমযোজ্যতা বা covalency)।

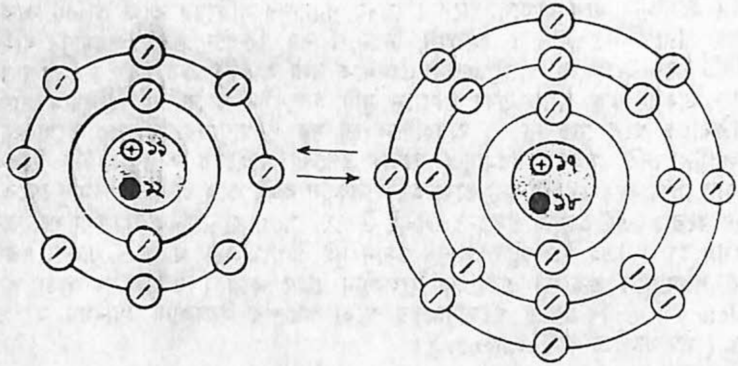
তড়িৎ যোজ্যতা বা (electrovalency)

পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় নিস্তড়িত। পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহন বা বর্জন করে আয়নে পরিণত হয়। ধাতুগুলির পরমাণু ইলেকট্রন বর্জন করে ক্যাটায়ন বা ধনাত্মক তড়িত ধর্মী, এবং অধাতুগুলির পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন বা ঋণাত্মক তড়িত ধর্মী আয়নে পরিণত হয়। এই বিপরীত ধর্মী আয়ন গুলি পরস্পর তড়িত আকর্ষনে আবদ্ধ হয়ে যৌগ গঠন করে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl) যৌগ।



৬ (ক) সোডিয়াম পরমাণু (খ) ক্লোরিন পরমাণু ⊕ প্রোটন • নিউট্রন

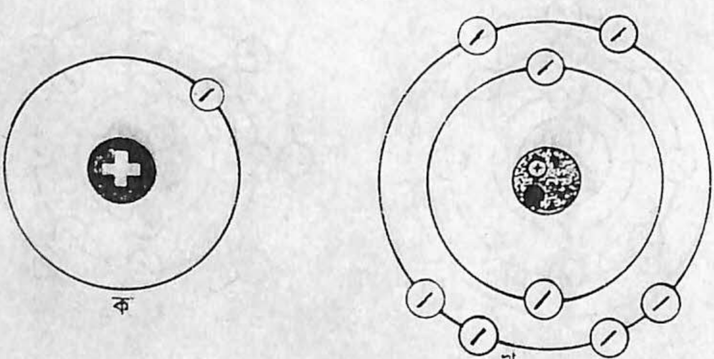
সোডিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা হলো ১১। এর ইলেকট্রন বিন্যাস যথাক্রমে K কক্ষে ২, L কক্ষে ৮, এবং M কক্ষে ১। ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা হলো ১৭, এর ইলেকট্রন বিন্যাস যথাক্রমে K কক্ষে ২, L কক্ষে ৮, এবং M কক্ষে ৭। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময়ে যখন একটা সোডিয়াম পরমাণুকে একটা ক্লোরিন পরমাণুর কাছে আনা হয় তখন সোডিয়াম তার N কক্ষে অবস্থিত ইলেকট্রনটি ত্যাগ করে ($Na\text{-}e = Na^+$) সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয় এবং ক্লোরিন ঐ ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে ($cl+e = cl^-$) ক্লোরিন আয়নে পরিণত হয়, এখন এই দুটি বিপরীত ধর্মী আয়নসমূহের মধ্যে তড়িতাকর্ষণ বলের জন্য যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় তড়িতযোজ্যতা এবং যৌগটি অর্থাৎ এক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা (Nacl) কে বলা হয় তড়িতযোজী যৌগ।



৭ তড়িৎযোজ্যতা
M কক্ষ থেকে ইলেকট্রনের স্থান পরিবর্তন

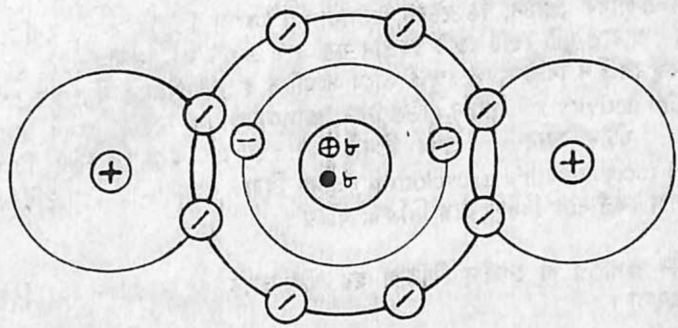
সমযোজ্যতা (Covalency)

যেখানে দুটি পরমাণুই ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চায় সেখানে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয় ভিন্ন উপায়ে। সে ক্ষেত্রে পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রন যুগ্মকে ভাগাভাগি করে নেয়। যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু হাইড্রোজেনেরও K কক্ষ পূর্ণ করার জন্য একটি ইলেকট্রন দরকার আবার অক্সিজেনেরও L কক্ষ পূর্ণ করার জন্য দুটি ইলেকট্রন দরকার।



৮ (ক) হাইড্রোজেন পরমাণু (খ) অক্সিজেন পরমাণু।

সুতরাং যখন এরা একত্র হয়ে জল তৈরি করে তখন এদের মধ্যেকার বন্ধনী নিম্নরূপ হয়।



৯ সমযোজ্যতার ফলে সৃষ্ট জলের একটি অণু

এক্ষেত্রে ইলেকট্রন যুগলের দুটি ইলেট্রনই প্রত্যেক পরমাণু অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাসায়নিক সংযোগ সাধিত হতে পারে দু ভাবে, হয় ইলেকট্রন স্থানান্তর করে কিংবা ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে। এ ধরনের সংযোগ অবশ্য ভেঙ্গে ফেলাও যায়। যখন তড়িৎ যোজ্যতা বা সমযোজ্যতার সাহায্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তখন অংশ গ্রহণকারী পরমাণুদের ইলেকট্রন গুলি নতুন ভাবে সজ্জিত হয়। দুটি প্রক্রিয়াতে ইলেকট্রনদের স্থিতিশক্তি পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্থিতিশক্তি কমে গেলে সেই তারতম্য তাপ হিসাবে বেড়িয়ে আসে তাকে বলা হয় তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বা exothermic reaction, অপরদিকে স্থিতিশক্তি যদি বেড়ে যায় তবে সেই তারতম্যটুকু যোগান দিতে গিয়ে বিক্রিয়ার তাপমাত্রা কমে যায়, একে বলা হয় তাপগ্রাহী বিক্রিয়া বা endothermic reaction। সোডিয়াম ও ক্লোরিন পরমাণু যখন সংযোজিত হয়ে যৌগ গঠন করে তখন তাপ বেড়িয়ে আসে। নাইট্রোজেন যখন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে তখন তাপমাত্রা কমে যায়। কয়লা বা গ্যাস দহনের ফলে প্রভূত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় যাকে আমরা শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার তুলনা

সব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনেরা অংশ গ্রহণ করে, হয় ইলেকট্রনেরা স্থানান্তরিত হয় নয়ত একে অপরের সংগে ভাগাভাগি করে নেয়। এর ফলে রাসায়নিক বন্ধন তৈরী হয়। এই সব রাসায়নিক বন্ধন আবার ভেঙ্গে ফেলাও যায়, কিন্তু কেন্দ্রীন উভয় ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত থাকে। কিছু কিছু বিক্রিয়া ছাড়া রাসায়নিক বিক্রিয়া সমূহের তাপমাত্রার অল্পই পরিবর্তন হয়। অপরদিকে যে সব বিক্রিয়াতে কেন্দ্রীনরা অংশ গ্রহণ করে তাদের বলা হয় কেন্দ্রীন বিক্রিয়া (Nuclear reaction)। কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় তাপমাত্রার বিরাট পরিবর্তন হয়।

কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার রকমফের

একটি কেন্দ্রীন বিক্রিয়াতে বড় কেন্দ্রীন ছোট ছোট কেন্দ্রীনে ভেঙ্গে যেতে পারে। এর ফলে এক বা একাধিক প্রোটন, ডিউটেরন, আলফাকণা কিংবা নিউট্রন কণাও বেড়িয়ে আসতে পারে। আবার দুটি ছোট ছোট কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে একটি বড় কেন্দ্রীন তৈরী হতে পারে। কিছু কিছু কেন্দ্রীন বিক্রিয়া স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সংঘটিত হয় সে গুলিকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা বা radio activity। প্রোটন, ডিউটেরন, আলফাকণা ও নিউট্রন এদের দ্বারা কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ঘটান সম্ভব। প্রথম তিনটি কণা ধনাত্মক হওয়ার দরুণ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে (accelatrator e.g. cyclotron) এদের বিরাট পরিমাণ গতিবেগ সৃষ্টি করা হয়। তখন এরা কেন্দ্রীনকে বিদীর্ণ করে বিক্রিয়া ঘটায়।

কেন্দ্রীন রূপান্তর বা কেন্দ্রীন বিক্রিয়া হয় তিন ভাবে, ১। সংযোজন, ২। বিভাজন, ৩। তেজস্ক্রিয়তা।

১। সংযোজন প্রক্রিয়া – এই প্রক্রিয়ায় দুটি হাল্কা কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে একটি ভারী কেন্দ্রীন সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার মধ্যে এই প্রক্রিয়াতে সবচেয়ে বেশী শক্তির সৃষ্টি হয়। সূর্যে যে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ঘটে তা সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে। এখানে দুটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরী করে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। সংযোজন প্রক্রিয়া সংঘটিত করতে গেলে শুরুতে খুব উচ্চতাপের প্রয়োজন।

২। কেন্দ্রীন বিভাজন – এই প্রক্রিয়া দ্বারা একটি কেন্দ্রীন দুটি কেন্দ্রীনে ভেঙ্গে যায় এবং শক্তি নির্গত হয়।

$$_{৯২}U^{২৩৫} + {}_{0}n^{১} \rightarrow {}_{৫৬}Br^{১৪০} + {}_{৩৬}Kr^{৯৩} + ৩_{0}n^{১} + \text{শক্তি}$$

বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু করতে গেলে প্রথমে বিভাজনকারী বস্তুকে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করতে হয়। ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম ও থোরিয়ামের প্রধানতঃ বিভাজন হয়। বিভাজন প্রক্রিয়ায় নির্গত শক্তি সংযোজন প্রক্রিয়ার চেয়ে কম হয়।

৩। তেজস্ক্রিয়তা – কিছু কিছু পদার্থ আছে যাদের কেন্দ্রীনরা অসুস্থিত। এরা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে তিন ধরণের রশ্মি α রশ্মি (হিলিয়াম রশ্মি), β রশ্মি (ইলেকট্রন), ও γ রশ্মি (তড়িত চুম্বকীয় তরঙ্গ) নির্গত করে ক্রমে সুস্থিত কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়। এই কেন্দ্রীন বিক্রিয়াকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা। এই কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় শক্তি নির্গত হয় না বললেই চলে। কৃত্রিম উপায়ে কিছু কিছু কেন্দ্রীন সৃষ্টি করা যায় যারা তেজস্ক্রিয়ভাবে লয় পেতে থাকে। এদেরকে রেডিও আইসোটোপ বলে।

ভরত্রুটি (mass defect)

যখন কতকগুলি নিউক্লিয়ন (প্রোটন ও নিউট্রন) মিলিত হয়ে একটি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন তৈরি করে তখন দেখা যায় সৃষ্ট কেন্দ্রীনের সামগ্রিক ভর, নিউক্লিয়নদের সম্মিলিত ভরের চেয়ে কম। ভরের এই হ্রাসকেই বলা হয় ভরত্রুটি, উদাহরণ স্বরূপ বলা

যেতে পারে হিলিয়াম কেন্দ্রীনে ৪টি নিউক্লিয়ন আছে। ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন। এদের সম্মিলিত ভর হলো (২ × ১˙০০৮১৩ + ২ × ১˙০০৮৯৫) = ৪˙০৩৪১৬ এবং হিলিয়াম কেন্দ্রীনের মোট ভর হচ্ছে ৪˙০০২৮০ এক্ষেত্রে ত্রুটি দাঁড়াচ্ছে (৪˙০৩৪১৬ – ৪˙০০২৮০) = ০˙০৩১ পারমাণবিক ভর একক। আইনষ্টাইনের $E = mc^2$ সূত্র অনুযায়ী এই ভরের সমতুল শক্তি হলো ২৮ mev এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে প্রতিটি নিউক্লিয়ন গড়ে ৭ mev করে শক্তি হারাচ্ছে। এই হারানো শক্তি সৃষ্ট কেন্দ্রীনের নিউক্লিয়ন গুলির মধ্যেকার বন্ধনশক্তি সরবরাহ করছে।

এখন সংযোজন ও বিভাজন দুটি প্রক্রিয়ায়, বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণকারী কেন্দ্রীন গুলির সামগ্রিক ভর বিক্রিয়ায় সৃষ্ট কেন্দ্রীন গুলির সামগ্রিক ভরের চেয়ে বেশী হয়। এক্ষেত্রে ভরের এই হ্রাস বা ভরত্রুটি বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির সমতুল। তেজস্ক্রিয়তায় এই ভরত্রুটি এতই সামান্য যে শক্তির নির্গমন হয় না বললেই চলে।

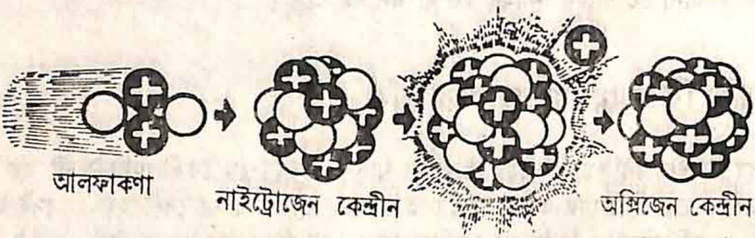
কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় বেড়িয়ে আসা শক্তি

সব কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় ভরের তারতম্য ঘটে। নতুন যে কেন্দ্রীনগুলি তৈরী হয় তাদের সম্মিলিত ভর বিক্রিয়ার আগে কেন্দ্রীনের যে ভর তার কম বা বেশী হয়। সেই অনুযায়ী শক্তি তেজস্ক্রিয়তাতে নির্গত বা শোষিত হয়। তেজস্ক্রিয়তার ভরের হ্রাস খুব কম, কেন্দ্রীন সংযোজন ও বিভাজন প্রক্রিয়াতে কিন্তু ভরের হ্রাস খুব বেশী। যে পরিমান ভরের হ্রাস ঘটে তা অইনস্টাইনের $E = mc^2$ অনুযায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। E হলো মোট শক্তির পরিমাণ, m ভরের হ্রাস আর c হলো আলোর গতিবেগ। হ্রাসপ্রাপ্ত ভরের পরিমাণ বেশী হওয়ার জন্য তেজস্ক্রিয়তার চেয়ে সংযোজন ও বিভাজন প্রক্রিয়াতে বেশী শক্তি নির্গত হয়। যে সব বিক্রিয়াতে ভরের বৃদ্ধি ঘটে সেখানে এই সমীকরণ অনুযায়ী শক্তির যোগান দিতে হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াতে হ্রাসপ্রাপ্ত ভরের পরিমাণ এতই সামান্য যে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তা কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির ১/১,০০০,০০০ ভাগ। এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম সম্পূর্ণ ভাবে বিভাজিত হলে যে শক্তি বেরোবে তা দুই মিলিয়ান কিলোগ্রাম কয়লা পোড়ালে যে শক্তি বেরোবে তার সমান। বিভাজন, সংযোজন ও তেজস্ক্রিয়তা এই তিন প্রকার বিক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তা উপরোক্ত সমীকরণ দিয়ে নির্ধারিত হয়। সাধারণ বিক্রিয়ায় যেখানে তাপ বেরোয় সেখানেও কিন্তু শক্তি নির্গত হচ্ছে সুতরাং সেখানেও নিশ্চয়ই ভরের হ্রাস ঘটছে। কিন্তু এই ভরের তারতম্য এত কম যে ধরা যায় না। আমরা জানি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন আদান প্রদান ঘটে একটা পরমাণু সুস্থিত হয় এবং ইলেকট্রনটির স্থিতি শক্তির পরিবর্তন ঘটে। এই স্থিতিশক্তির পরিবর্তনকেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির তারতম্যের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

নাইট্রোজেনের অক্সিজেনে রূপান্তর

১৯১৯ সালে লর্ড রাদারফোর্ড প্রথম কেন্দ্রীন বিক্রিয়াটি ঘটান। এজন্য তিনি নাইট্রোজেন কেন্দ্রীনকে দ্রুতগামী হিলিয়াম কেন্দ্রীন বা আলফাকণা দিয়ে আঘাত করলেন।

আলফাকণাতে দুটো প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আছে। একখণ্ড সীসার মধ্যে গর্ত করে তাতে রেডিয়াম রাখলে সেখান থেকে আলফাকণা বেড়িয়ে আসে। এটাই হলো রাদারফোর্ডের পারমাণবিক বন্দুক। তিনি দেখতে পেলেন বিক্রিয়াতে কিছু কিছু নাইট্রোজেন কেন্দ্রীন অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, যে সব কেন্দ্রীন রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তাদের থেকে একটি মুক্ত প্রোটন বেড়িয়ে আসছে।



১০ নাইট্রোজেন কেন্দ্রীনের অক্সিজেন কেন্দ্রীনে রূপান্তর।

এই বিক্রিয়াটি এই ভাবে লেখা যায় –

$$_{৭}N^{১৪} + _{২}He^{৪} \rightarrow {}_{৮}O^{১৭} + {}_{১}H^{১}$$

সৃষ্ট অক্সিজেন ১৭, সাধারণ অক্সিজেন-১৬র আইসোটোপ। এদের তড়িতাধানের পরিমাণ সমান (৮) কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন (৮ ও ৯)। এইজন্য এদের পারমাণবিক ভরও বিভিন্ন। এই বিখ্যাত পরীক্ষাটি সম্পাদন করে ছোটো খাটো ভাবে হলেও রাদারফোর্ড দেখাতে সমর্থ হলেন যে কৃত্রিম ভাবে এক ধরণের কেন্দ্রীন থেকে আরেক কেন্দ্রীন সৃষ্টি করা সম্ভব। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে একটি মৌলিক বস্তু থেকে আরেকটি মৌলিক বস্তু তৈরি করার ব্যাপারটা সম্ভব। প্রাচীনকালে রসায়নবিদেরা এই কাজ সম্পাদন করতে বহু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেননি। আজ কেন্দ্রীন রিয়েকটারের সাহায্যে ও পরমাণুচূর্ণকারী যন্ত্রের সাহায্যে এ ধরণের বহু পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয়েছে। পারদ কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে সামান্য পরিমাণে সোনা তৈরি সম্ভব হয়েছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে বেশি পরিমাণ সোনা তৈরি করার খরচ সাধ্যের বাইরে চলে যাবে।

কেন্দ্রীন বিক্রিয়া গবেষণার এক নতুন দিক খুলে দিয়েছে; সন্ধান দিয়েছে শক্তির বিরাট এক উৎসের – যে পরিমাণ শক্তির কথা মানুষ ভাবতেই পারত না।

৪ কেন্দ্রীন বিভাজন

চ্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করলেন

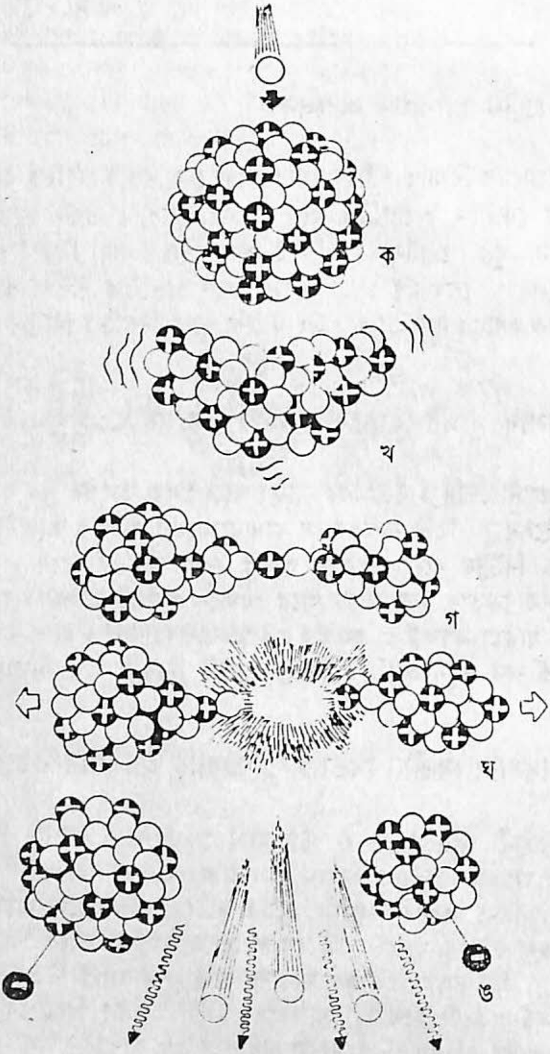
লর্ড রাদারফোর্ডের বিখ্যাত পরীক্ষা থেকে জানা গেল একটি মৌলিক বস্তুর কেন্দ্রীনকে অন্য মৌলিক বস্তুর কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত করে দেওয়া সম্ভব । তখন পর্যন্ত কেন্দ্রীনে শুধুমাত্র ধনাত্মক আধান যুক্ত প্রোটনদের অস্তিত্বই জানা ছিল । অন্য বিজ্ঞানীরা এধরণের আরও পরীক্ষা চালালেন । শেষপর্যন্ত ১৯৩২ সালে জেমস্ চ্যাডউইক্ প্রতিষ্ঠা করলেন যে পরমাণুর কেন্দ্রীনে আরেক ধরণের কণা আছে । এই কণারা হলো নিস্তড়িত নিউট্রন কণা ।

ফের্মি নিউট্রনকে বুলেট হিসাবে ব্যবহার করলেন

ইতালীয় বিজ্ঞানী ফের্মি চ্যাডউইকের আবিষ্কারের প্রকৃত তাৎপর্য খুব তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন । তিনি বললেন যে রাদারফোর্ডের ধনাত্মক আধানযুক্ত আলফা কণার চেয়ে নিস্তরিত নিউট্রন বুলেট হিসাবে অনেক বেশী কার্যকরী হবে । নিউট্রন ধনাত্মক কেন্দ্রীনের অনেক ভেতরে চলে যেতে পারে যেখানে ধনাত্মক আলফাকণার পক্ষে বিকর্ষণের দরুণ বেশীদূর যাওয়া কষ্টকর । ফের্মির এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হলো যখন ইউরেনিয়ামের মত ভারী কেন্দ্রীনকে নতুন আবিষ্কৃত নিউট্রন বুলেট দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হলো ।

হ্যান ও স্ট্র্যাসম্যান কেন্দ্রীন বিভাজন প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করলেন

জার্মানীর বিজ্ঞানী অটো হ্যান ও স্ট্র্যাসম্যান ১৯৩৯ সালে কেন্দ্রীন বিভাজন প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করে জগৎকে চমকিত করলেন । তাঁরা দেখলেন যে $_{৯২}U^{২৩৫}$ এর কেন্দ্রীনকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে সমান ভরের দুটো অংশে ভেঙ্গে যাচ্ছে । এই দুটো অংশকে বিভাজন ভগ্নাংশ বলে । এই বিক্রিয়ায় অপ্রত্যাশিত ভাবে বিরাট পরিমাণ শক্তি বেড়িয়ে আসে । কি ভাবে বিভাজন ঘটানো হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে বিস্ফোরণের পর কি কি কেন্দ্রীন তৈরী হবে । সাধারণতঃ $_{৯২}U^{২৩৫}$ ভেঙ্গে গিয়ে বেরিয়াম ও ক্রিপটন কেন্দ্রীন হয় । এদের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬ ও ৩৬ । অন্য ধরণের কেন্দ্রীন ও অবশ্য তৈরী হতে পারে । তৈরী হবার মুহূর্তে এই কেন্দ্রীনরা বেশী পরিমাণে তেজস্ক্রিয় ও এদের প্রভূত গতিশক্তি থাকে । তাই এরা বিকর্ষিত হয়ে সজোরে পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় । শক্তি এবং বিকিরণ বেড়িয়ে আসার দরুণ কেন্দ্রীনগুলি ক্রমশঃ সুস্থিত হয়ে যায় । এই ভাবে কেন্দ্রীনের ভেঙ্গে যাওয়াকে কেন্দ্রীন বিভাজন বা Fission বলে । বিভাজনের বিভিন্ন ধাপ নীচে দেখান হলো ।



১১ কেন্দ্রীন বিভাজন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়

(ক) একটি নিউট্রন ৯২$U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনে প্রবেশ করল।

(খ) এই নিউট্রনটি শোষণকরে ৯২$U^{২৩৫}$ অসুস্থিত ৯২$U^{২৩৫}$ এ পরিণত হলো।

(গ) এর পরে ৯২$U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনটির ছবির মত আকার ধারণ করল।

(ঘ) এবার কেন্দ্রীন দুটি সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত শক্তি নির্গত হলো।

(ঙ) নতুন সৃষ্ট কেন্দ্রীন দুটি পরস্পর থেকে বিকর্ষিত হয়ে দূরে সরে গেল এবং গামারশ্মি, বিটারশ্মি ও ২ কি ৩ টি নিউট্রন নির্গত করে সুস্থিত হয়ে গেল।

একটি নিউট্রন 'n' একটি $_{৯২}U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনকে আঘাত করল। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীন নিউট্রনটিকে শোষণ করে নিল। এর ফলে $_{৯২}U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনের সৃষ্টি হল। এই কেন্দ্রীনটি অসুস্থিত এবং এর মধ্যে ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টি হয় ফলে কেন্দ্রীনটি প্রায় দুটি সমান অংশে ভেঙ্গে যায়। ভগ্নাংশগুলি একে অপরের থেকে দুরে সরে যায়।

এই আবিষ্কার বাস্তবিকই উত্তেজনা পূর্ণ। অচিরেই পৃথিবী জুড়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেল। একটা কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য অথবা কেন্দ্রীন রিয়েকটার চালানোর জন্য অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ $_{৯২}U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনে বিভাজন দরকার। হ্যান ও স্ট্রাসম্যানের আবিষ্কার খানিকটা এলোমেলো হওয়ার দরুণ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বিভাজন প্রক্রিয়া কি ভাবে চালানো সম্ভব তা নির্দ্দেশ করতে পারে নি। তবে বিভাজন সংক্রান্ত গবেষণার পথিকৃত এঁরাই।

৫ পারমাণবিক বোমা

কেন্দ্রীন বিভাজন ও মুক্ত নিউট্রন

কেন্দ্রীন বিভাজন সংক্রান্ত পরীক্ষার পরিপূর্ণ রূপ দেন্ ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও ও কিছু আমেরিকান বিজ্ঞানী। তাঁরা দেখলেন যে প্রতি ${}_{৯২}U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীন বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে দুই বা তিনটি মুক্ত নিউট্রন বেড়িয়ে আসে।

কেন্দ্রীন বিভাজনের সামগ্রিক চেহারাটা হলো –

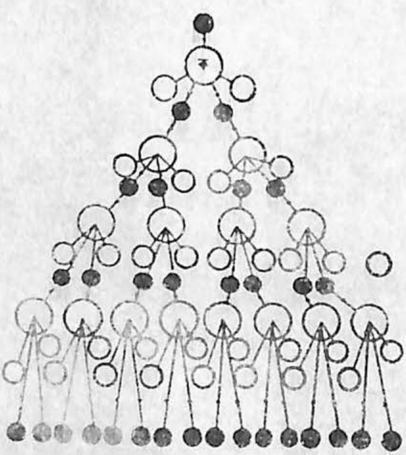
$${}_{৯২}U^{২৩৫} + {}_{০}U^{১} \rightarrow {}_{৫৬}Ba^{১৪০} + {}_{৩৬}Kr^{৯৩} + ৩\,{}_{০}n^{১} + \text{শক্তি}$$

$U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীন	নিউট্রন	বেরিয়াম কেন্দ্রীন	ক্রিপটন কেন্দ্রীন	নিউট্রন

লক্ষ্য রাখা দরকার যে বিক্রিয়ার আগে ও পরে পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা স্থির থাকছে। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যাবে ভরত্রুটি একটা থেকেই যাচ্ছে।

চেইন বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া

কেন্দ্রীন বিভাজনের মত সুদূর প্রসারী এই আবিষ্কার নতুন নতুন সম্ভবনার পথ খুলে দিল। একটি কেন্দ্রীন বিভাজনে যে নিউট্রন বেড়িয়ে আসে তারা আবার নতুন কেন্দ্রীন বিভাজন ঘটাতে পারে। এইভাবে প্রতিটি কেন্দ্রীন বিভাজনে বেড়িয়ে আসা নিউট্রন নতুন করে আরও বিভাজন সৃষ্টি করবে এবং তাতে আরও মুক্ত নিউট্রন বেড়িয়ে আসবে। স্বয়ংক্রিয় ভাবে বিভাজন প্রক্রিয়াটি চলতেই থাকবে। একেই আমরা বলি শৃঙ্খল বা চেইন বিক্রিয়া।



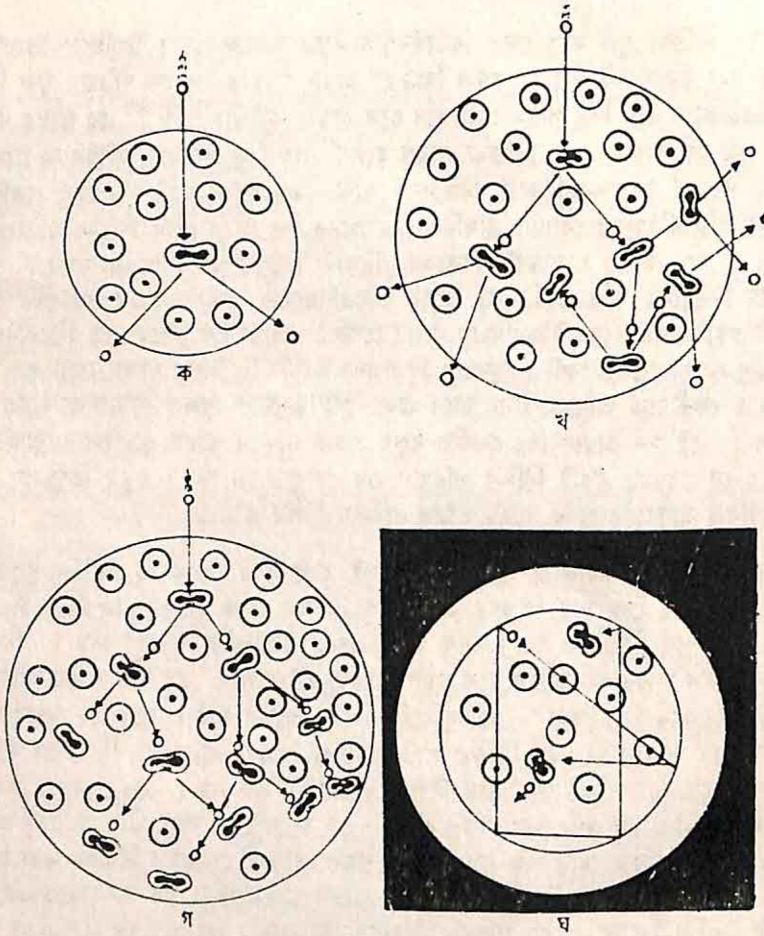
১২ শৃঙ্খল বিক্রিয়া ● নিউট্রন

(ক) ${}_{৯২}U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীন ○ বিভাজন ভগ্নাংশ

সংকট ভর (Critical mass)

শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হতে গেলে বিভাজনশীল বস্তুর ন্যূনতম ভরের উপস্থিতি প্রয়োজন। একে বলা হয় সংকট ভর। শৃঙ্খল বিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর যে পরিমাণ মুক্ত নিউট্রন বেড়িয়ে আসে তার কিছু পরিমাণ বাতাসে চলে যায়। সুতরাং $_{৯২}U^{২৩৫}$ এর ভরের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে শৃঙ্খল বিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর কিছু পরিমাণ নিউট্রন বাতাসে চলে গিয়ে পরবর্তী বিভাজনসৃষ্টিকারী নিউট্রনের সংখ্যা কম পড়ে যাবে। কিন্তু একটি বড় খণ্ডের ইউরেনিয়ামের বেলাতে প্রাথমিক বিভাজনের পর যে পরিমাণ নিউট্রন বাতাসে চলে যাবে তা বাদ দিয়েও আভ্যন্তরীণ বিভাজন সৃষ্টিকারী নিউট্রন অনেক পাওয়া যাবে। এছাড়া একটি নিউট্রনের পক্ষে একটি বড় ভরের ইউরেনিয়ামকে আঘাত করার সম্ভাব্যতা অনেক বেশী একটি ছোট ভরের ইউরেনিয়াম খণ্ডের চেয়ে। এছাড়া এক টুকরো বড় ইউরেনিয়ামের পরমাণু সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং বিভাজনসৃষ্টিকারী নিউট্রনের সংখ্যা বেশী হলে বেশী সংখ্যক কেন্দ্রীনকে আঘাত হানা যাবে এবং সেই অনুযায়ী শৃঙ্খল বিক্রিয়ার হারও বৃদ্ধি পাবে। এই সব কারণে বিভাজনশীল বস্তুর একটি ন্যূনতম ভরের প্রয়োজন। সংকট ভর বলতে যে সবসময় একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভর বোঝায় তা নয়। বস্তুর বিশুদ্ধতা, ঘনত্ব, জ্যামিতিক আকারের ওপর সংকট ভরের পরিমাণ নির্ভর করে।

একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় যে কটি নিউট্রন সৃষ্ট হচ্ছে আর যে কয়টি নিউট্রন প্রকৃতপক্ষে বিভাজন ঘটায় সেই দুটি সংখ্যার অনুপাতকে বিবর্ধক গুণক (multiplication factor) বলে। শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় এই বিবর্ধক গুণক একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়। বিবর্ধক গুণকের মান ১ এর অনেক কম হলে শৃঙ্খল বিক্রিয়া ঘটবে না। এর মান ১ এর কাছাকাছি বা ১ এর সমান হলে শৃঙ্খল বিক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অগ্রসর হবে। আর এই গুণকের মান ১ অতিক্রম করে গেলে শৃঙ্খল বিক্রিয়া আর সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে না, অর্থাৎ বিস্ফোরণ ঘটবে। আগেই বলেছি, সংকট ভর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ভর নয়। বস্তুর বিশুদ্ধতা, ঘনত্ব, জ্যামিতিক আকারের ওপর এটা নির্ভর করে। এর কারণ হলো বস্তুর ঘনত্ব বা ব্যাস কমিয়ে দিয়ে এই গুণকের মান বৃদ্ধি করা যায় ও শৃঙ্খল বিক্রিয়া সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইমপ্লোসন পদ্ধতি। ভারত ১৯৭২ সালে থর মরুভূমিতে এইভাবে একটি কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। সাধারণ রিয়েকটারে এই গুণকের মান ১ এ রাখা হয় ফলে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় ও শক্তি উৎপন্ন হয়। পারমাণবিক বোমায় এই গুণকের মান একের চেয়ে বেশী করা হয় ফলে বিক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং বিস্ফোরণ ঘটে। অনেক সময় কেন্দ্রীন শক্তি চালিত অস্ত্রে নিউট্রন প্রতিফলক ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ শৃঙ্খল বিক্রিয়া থেকে যে মুক্ত নিউট্রন বেড়িয়ে বাতাসে চলে যায় তারা প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে আবার বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এই ভাবেও কিন্তু সংকট ভরের পরিমাণ কমান যায়।



১৩ (ক) ইউরেনিয়াম খণ্ডের ভর সংকট ভরের থেকে কম। বিবর্ধক গুণকের মান ১ এর কম। ফলে বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হলেও শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয় না।

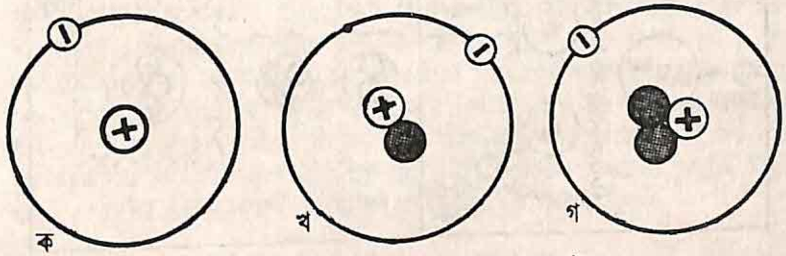
(খ) ইউরেনিয়াম খণ্ডের ভর সংকট ভরের সমান। বিবর্ধক গুণকের মান ১ এর সমান। ফলে শৃঙ্খল বিক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অগ্রসর হয়।

(গ) ইউরেনিয়াম খণ্ডের ভর সংকট ভরের চেয়ে বেশী। বিবর্ধক গুণকের মান ১ এর বেশী। ফলে শৃঙ্খল বিক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অগ্রসর হয় ও বিস্ফোরণ ঘটে।

(ঘ) নিউট্রন প্রতিফলক ব্যবহার করে সংকট ভরের মান কমিয়ে আনা হয়েছে।

হাইড্রোজেন আইসোটোপ

মৌলিক বস্তুদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা হলো হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ। প্রথমটি হলো ভারী হাইড্রোজেন বা ডিউটেরিয়াম ও অপরটি হলো ট্রিটিয়াম। ডিউটেরিয়ামের কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন, ট্রিটিয়ামের কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। এটা মনে রাখা দরকার যে হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটি মাত্র প্রোটন, কোন নিউট্রন নেই।



১৪ হাইড্রোজেন-এর আইসোটোপ।
(ক) – সাধারণ হাইড্রোজেন,
(খ) – ডিউটেরিয়াম,
(গ) – ট্রিটিয়াম।

ডিউটেরিয়ামের কেন্দ্রীনকে বলা হয় ডিটটেরণ, ট্রিটিয়ামের কেন্দ্রীণকে বলা হয় ট্রাইট্রন, ১৯৩২ সালে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ইউরে ভারী হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন।

কেন্দ্রীন সংযোজন (Nuclear fusion)

যখন দুটি ডিউটেরিয়াম বা একটি ডিউটেরিয়াম ও একটি ট্রিটিয়াম কেন্দ্রীনকে ১০ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রি উষ্ণতায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরী করে এবং প্রভূত শক্তি নির্গত হয়। হাল্কা হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে ভারী হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরী হবার ব্যাপারটিকে বলা হয় কেন্দ্রীন সংযোজন বা Nuclear fusion. হিলিয়ামের কেন্দ্রীনে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকে। সংযোজন প্রক্রিয়ার সমীকরণ নিম্নরূপে লেখা যায় –

(১) ২ ডিউটেরিয়াম কেন্দ্রীন → ১ হিলিয়াম কেন্দ্রীন + শক্তি

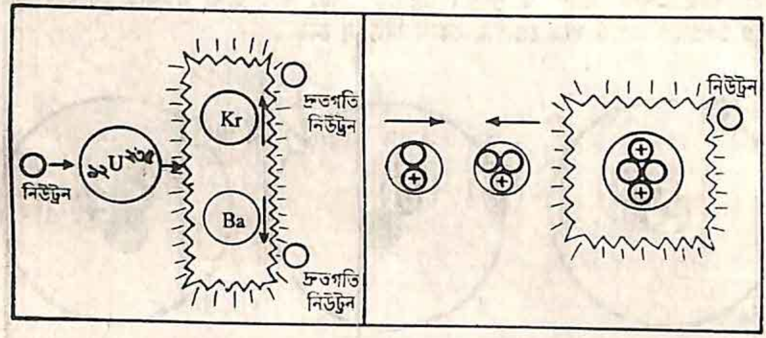
$২\,{}_{১}H^{২} \rightarrow {}_{২}He^{৪}$ + শক্তি

(২) ১ ডিউটেরিয়াম কেন্দ্রীন ১ ট্রিটিয়াম কেন্দ্রীন → ১ হিলিয়াম কেন্দ্রীন + ১ নিউট্রন + শক্তি

${}_{১}H^{২} + {}_{১}H^{৩} \rightarrow {}_{২}He^{৪} + {}_{0}n^{১}$ + শক্তি

বিভাজন ও সংযোজনের তুলনা

বিভাজন বা fission প্রক্রিয়ায় ভারী অসুস্থিত কেন্দ্রীন দুটি সুস্থিত কেন্দ্রীনে ভেঙ্গে যায়। সংযোজন বা fusion প্রক্রিয়ায় দুটি হাল্কা অসুস্থিত কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে ভারী ও সুস্থিত কেন্দ্রীন তৈরী করে। দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু সুস্থিত কেন্দ্রীন তৈরী হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।



১৫ কেন্দ্রীন বিভাজন ও সংযোজনের তুলনা।
(ক) কেন্দ্রীন বিভাজন যেখানে ভারী কেন্দ্রীন একটি শ্লথ নিউট্রনের আঘাতে দুটি হাল্কা কেন্দ্রীনে ভেঙ্গে যায়।
(খ) কেন্দ্রীন সংযোজন – এখানে দুটি হাল্কা কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে ভারী সুস্থিত কেন্দ্রীন তৈরী হয় উভয় প্রক্রিয়ায় প্রভূত শক্তি নির্গত হয়।

বিভাজন প্রক্রিয়াতে তড়িৎবিহীন শ্লথ নিউট্রন সাধারণ তাপমাত্রায় ভারী পরমাণুর কেন্দ্রীনকে সহজেই বিদীর্ণ করে যেতে পারে। কিন্তু সংযোজন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীনগুলি একই ধরণের তড়িতাধান (ধনাত্মক) থাকার দরুণ সজোরে বিকর্ষিত হয়। এই বিকর্ষণ অতিক্রম করার জন্য তাদের উচ্চ গতিবেগ দরকার। কেন্দ্রীনগুলিকে দশ থেকে একশ মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তাদের অতি দ্রুতগতি আরোপ করা হয়। এই ধরণের উচ্চ গতিবেগ থাকার দরুণ তারা সহজেই বিকর্ষণ অতিক্রম করে সংযোজিত হয়ে যেতে পারে। এতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তা বিভাজন প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশী। সংযোজন প্রক্রিয়ায় লব্ধ শক্তিকে তাপ কেন্দ্রীণ শক্তি বলা হয়। কেননা তাপভূত গতির জন্য এ ধরণের বিক্রিয়া সম্ভব হচ্ছে।

পারমাণবিক অস্ত্র বা বোমা

পারমাণবিক অস্ত্র হলো সেই সব মারাত্মক অস্ত্র যেখানে কেন্দ্রীন শক্তির প্রভাবে বিস্ফোরণ ঘটে। এই সব অস্ত্র কেন্দ্রীন বিভাজন ও সংযোজন প্রক্রিয়ায় যে শক্তি বেড়িয়ে আসে তাকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করে। কি ভাবে শক্তি উৎপন্ন হবে তা মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়, ১। বিভাজন - (fission - one phase), ২। বিভাজন- সংযোজন (fission - fusion - two phase), ৩। বিভাজন ও সংযোজন (fission - fusion - fission - three phase) ।

১। প্রথম ধরণের পারমাণবিক অস্ত্রে বিস্ফোরনের শক্তি আসে $U^{২৩৫}$ অথবা $Pu^{২৩৯}$ -এর বিভাজনের থেকে। একে এ্যাটম বোমা বা পরমাণু বোমা বলা হয়। এই বোমায় নিউট্রন প্রতিফলক ব্যবহার করা হয়। এ ধরণের অস্ত্র কয়েকশ হাজার টন TNT (Trinitro tolulne)-র সমান হয়।

২। যে পরমাণু অস্ত্রে বিভাজন ও সংযোজনকে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা হয় তাকে আমরা হাইড্রোজেন বোমা আখ্যা দিয়ে থাকি। যদি বেশী পরিমাণে হাল্কা কেন্দ্রীনের (যেমন ডিউটেরণ ও ট্রিটিয়াম কেন্দ্রীনের মিশ্রণ) সংযোজন ঘটে তাহলে বিস্ফোরণ ঘটে ও প্রভূত শক্তি নির্গত হয়। একে বলা হয় তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া কিন্তু এই বিক্রিয়া ঘটাবার জন্য খুব উচ্চ তাপমাত্রা লাগে। হাইড্রোজেন বোমা তৈরীতে এই তাপকেন্দ্রীন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান হয়। প্রারম্ভিক উচ্চতাপের জন্য বিভাজন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান হয়। সেইজন্য হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেত্রে পরমাণু বোমার ভেতরে সংযোজনশীল বস্তুদের অর্থাৎ হাইড্রোজেন আইসোটোপদের রাখা হয়। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ হলে যে তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ দাড়ায় কয়েক বিলিয়ণ ডিগ্রি। এই তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের সংযোজন সুরু হয়ে যায়। ফলে এতে অতিরিক্ত শক্তি বেড়িয়ে আসে যা আরও কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ঘটায়। চোখের পলকে বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম কি পরিমাণ পাওয়া যায়

হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর ব্যাপারে একটি কাঁচা মাল হলো ডিউটেরিয়াম। সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাসে সামান্য পরিমাণ ডিউটেরন পাওয়া যায়। অনুপাত হিসাবে ১ : ৫০০০। সাধারণ জলেও সামান্য পরিমাণ ভারী জল পাওয়া যায়, প্রতি ১০,০০০ কিলোগ্রামে ৫০ গ্রাম। অপর কাঁচামাল ট্রিটিয়াম পাওয়া খুব শক্ত। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থাতে পাওয়া যায় না। বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি করে নিতে হয়।

সূর্যে সংযোজন প্রক্রিয়া

সূর্যের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীন সংযোজন প্রক্রিয়া অবিরাম হয়ে চলেছে। সূর্যের ভেতরকার তাপমাত্রা খুবই বেশী – প্রায় কুড়ি মিলিয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এত বেশী তাপমাত্রায় সংযোজন পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যায়, বিক্রিয়ায় বেড়িয়ে আসা শক্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

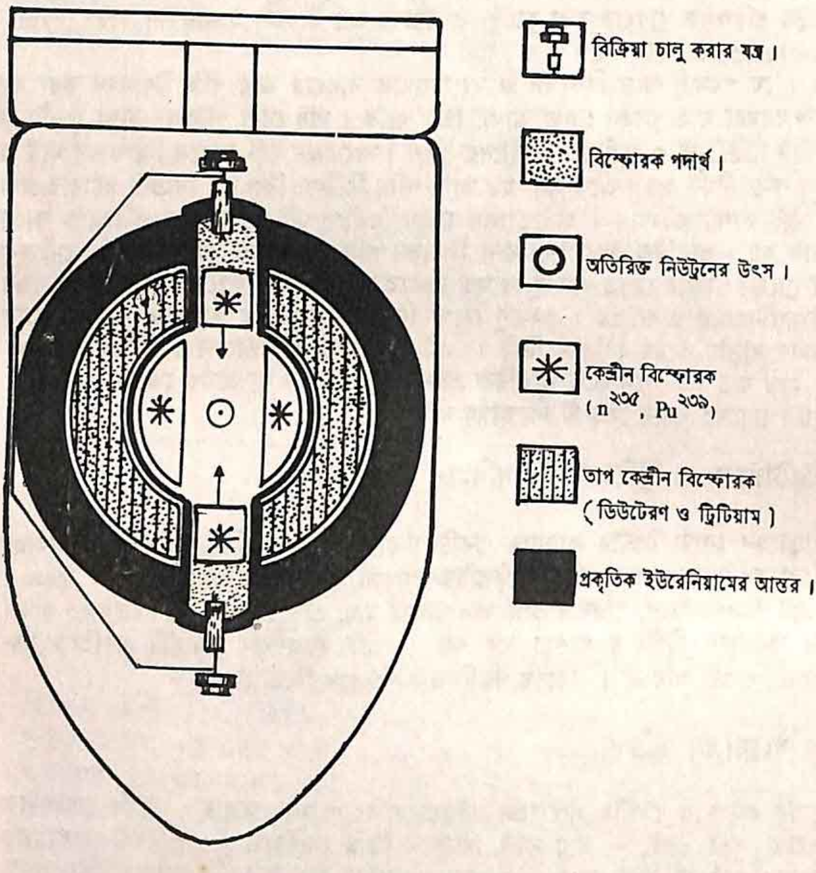
৩। বিভাজন-সংযোজন -বিভাজন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে যে পরমাণু বোমা বানান হয় তার বিস্ফোরণ ঘটান হয় এই তিনটি ধাপে,

ক। প্রথম অবস্থা ইউরেনিয়াম ২৩৫, প্লুটোনিয়াম ২৩৯ বা ইউরেনিয়াম ২৩৩ এর বিভাজনের ফলে প্রচণ্ড তাপের উৎপাদন।

খ। এই প্রচণ্ড তাপে ডিউটেরিয়াম বা ট্রিটিয়ামের মত হালকা কেন্দ্রীনের ভারী কেন্দ্রীনে রূপান্তর আরও তাপের সৃষ্টি।

গ। তৃতীয় অবস্থায় বোমার গাত্রাবরণে রাখা ইউরেনিয়াম ২৩৮ এর বিভাজন।

এই বোমা বিস্ফোরণে যে মোট শক্তি নির্গত হয় তার বেশীর ভাগ অংশেই আসে তৃতীয় অবস্থা থেকে। এই কারণে এই বোমাকে ইউরেনিয়াম বোমা বলা হয়। জ্বালানীর ভর সব সময় সংকট ভরের চেয়ে বেশী হয়। বোমার গাত্রবরণে যদি কোবাল্ট থাকে তাহলে একে কোবাল্ট বোমাও বলা হয়।

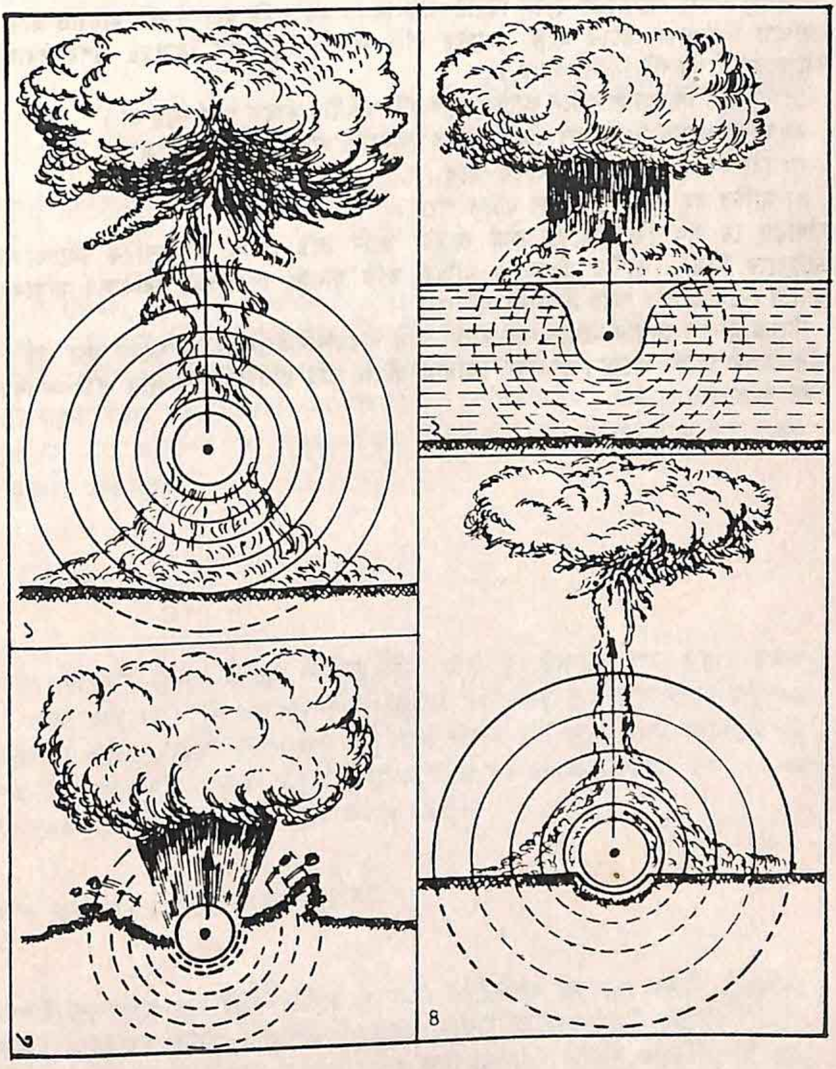


১৬ একটি ইউরেনিয়াম বোমার ছবি।

প্রয়োজনের আগে-যাতে জ্বালানীর ভর সংকট ভর অতিক্রম না করে সেইজন্য পারমাণবিক জ্বালানীতে ৪টি খণ্ডে ভাগ করে রাখা হয়। বিক্রিয়া চালু করলে এই খণ্ড গুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় সংকট ভর সৃষ্টি করে ও শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয়।

হাইড্রোজেন বোমার বেলাতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের আস্তরের বদলে কোন কঠিন ধাতুর আস্তর ব্যবহার করা হয়।

পরমাণু বোমার বেলাতে তাপকেন্দ্রীন বিস্ফোরকের জায়গায় নিউট্রন প্রতিফলক বসান থাকে ও প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের আস্তরের স্থানে কোন কঠিন ধাতুর আস্তর দেওয়া থাকে।



১৭ ১। বাতাসে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ২। জলের ভেতরে বোমা বিস্ফোরণ
৩। মাটির ভেতরে বোমা বিস্ফোরণ ৪। ভূ-ত্বকের ওপরে বোমা বিস্ফোরণ

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের রকম ফের

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে বিরাট শক্তি নির্গত হয়। কি ধরণের অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, কোথায় বিস্ফোরণ ঘটান হচ্ছে, বোমার শক্তি কত – এই সব বিষয়ের ওপর বোমা বিস্ফোরণের স্বরূপটি নির্ভর করবে।

১। বাতাসে বিস্ফোরণ ঘটলে আগ্নেয় গোলকটি পৃথিবীর ত্বককে স্পর্শ করে না।

২। ত্বকের ওপরে বিস্ফোরণ ঘটলে আগ্নেয় গোলকটি ত্বকের সংস্পর্শে থেকে যায়।

৩। বিস্ফোরণ জলের তলায় ঘটতে পারে।

৪। মাটির বহু নীচে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

সাধারণ যে সব বিস্ফোরণের কথা আমরা জানি তার থেকে পারমাণবিক বিস্ফোরণ একেবারে ভিন্ন। তাপীয় প্রভাব ও যান্ত্রিক ক্ষতি ছাড়াও তেজস্ক্রিয় বিকিরণে মানুষের জীবনে নেমে আসতে পারে নিদারুণ অভিশাপ।

নীচের ছবিতে দেখান হয়েছে কত রকম ভাবে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করা যায়। ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে বিস্ফোরণ কোথায় ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া কিভাবে এবং কতদুর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে।

৬ নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীন বিভাজন

কেন্দ্রীন বিভাজন ও তার নিয়ন্ত্রণ

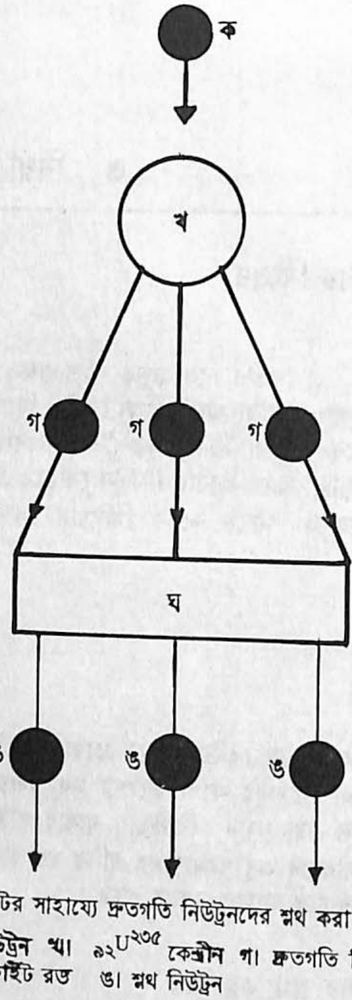
আমরা দেখেছি ৯২$U^{২৩৫}$ এ কেন্দ্রীন বিভাজনের দরুণ শৃঙ্খল বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যদি
এই শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ ঘটে।
প্রতিটি কেন্দ্রীন বিভাজনে দুটি বা তিনটি মুক্ত নিউট্রন বেড়িয়ে আসে যারা পর্যায়ক্রমে
আবার নতুন বিভাজনের সৃষ্টি করাতে আবার নিউট্রন বেড়িয়ে আসে। যদি এই প্রক্রিয়াটিকে
সংহত না করা হয় তবে কম সময়ে কয়েক মিলিয়ান কেন্দ্রীন ভেঙ্গে গিয়ে প্রচণ্ড এক
ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করবে।

শ্লথ নিউট্রন

শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় যে সব নিউট্রন বেড়িয়ে আসে তারা খুব উচ্চগতি সম্পন্ন হয়। অনেক
সময় দেখা যায় যে তারা পরমাণুর ফাঁপা অংশের মধ্য দিয়ে দ্রুত চলে যায় কেন্দ্রীনকে
আঘাত না করেই। ফলে এরা শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে। এই জন্য দ্রুতগতি
সম্পন্ন নিউট্রনদের গতি সাধারণ অনু পরমাণুদের গতির মত শ্লথ করে ফেলা হয়। তখন
তারা পরমাণুতে ঢুকে কেন্দ্রীনকে আঘাত করতে পারে।

কেমন করে নিউট্রনদের শ্লথ করা হয়

গ্রাফাইটের রডের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে দ্রুতগামী নিউট্রনদের শ্লথ করা হয়। এ ধরনের
গ্রাফাইট রডকে মডারেটার (moderator) বলে। গ্রাফাইটের বদলে ভারী জলকেও (D_2O)
নিউট্রন শ্লথ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। যখন দ্রুতগামী নিউট্রন মডারেটারের মধ্যে
দিয়ে যায় তখন তাদের মধ্যেকার হাল্কা কেন্দ্রীনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দ্রুতগতি নিউট্রন শ্লথ
হয়ে যায়। এই শ্লথ নিউট্রনদের তাপীয় (Thermal) নিউট্রন বলে। এই তাপীয়
নিউট্রনেরা ৯২$U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনকে আঘাত করতে বেশী সক্ষম। আর এই আঘাতের ফলে
আরও বিভাজনের সৃষ্টি হয়।



১৮ গ্রাফাইটের সাহায্যে দ্রুতগতি নিউট্রনদের শ্লথ করা হয়
ক। নিউট্রন খ। $_{৯২}U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীন গ। দ্রুতগতি নিউট্রন
ঘ। গ্রাফাইট রড ঙ। শ্লথ নিউট্রন

অতিরিক্ত নিউট্রন দূর করা হয় কি করে ?

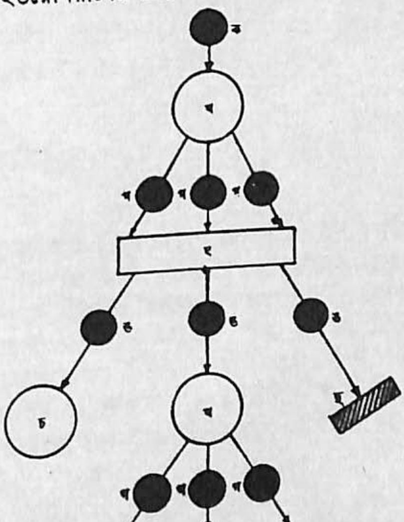
আগেই বলা হয়েছে যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভাজনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না করে যদি সীমাহীন ভাবে বাড়তে দেওয়া হলে প্রচণ্ড বিস্ফোরন ঘটবে । অপরদিকে অতিরিক্ত নিউট্রনদের দূরে সরিয়ে দিয়ে বিভাজনকে নির্দ্দিষ্ট হারে যদি বেধে রাখা যায় তাহলে প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হবে । এর ফলে বহুকাল ধরে শক্তি পাওয়া যাবে । ক্যাডমিয়াম রড ব্যবহার করে এই অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় নিউট্রন দূর করা যায় । এর কারণ হলো ক্যাডমিয়াম নিউট্রন শোষণ করে নেয় ।

নিউট্রন নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয়

দেখা গেল মডারেটারের সাহায্যে দ্রুতগতি নিউট্রনদের শ্লথ করে এবং ক্যাডামিয়ামের মধ্যে নিউট্রন শোষন করার পর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কেন্দ্রীন শক্তি পাওয়া সম্ভব।

কেন্দ্রীন জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম

শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীন শক্তি ব্যবহারই যদি লক্ষ্য হয় তবে স্বল্পমূল্য প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামকে কেন্দ্রীন জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে ০.৭% ভাগ ৯২$U^{২৩৫}$ থাকে। বাকী সব ৯২$U^{২৩৮}$। যদি এই ইউরেনিয়ামকে তাপীয় নিউট্রন দিয়ে আঘাত হানা হয় তাহলে ৯২$U^{২৩৫}$ অংশের কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটে। এর ফলে দ্রুতগতি নিউট্রন বেরোয় ও তাদেরকে গ্রাফাইট মডারেটারের সাহায্যে শ্লথ করা হয়। ৯২$U^{২৩৮}$ কেন্দ্রীন বিভাজন যোগ্য নয় - এরা কিছু নিউট্রন শোষণ করে প্লুটোনিয়াম নামে নতুন কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্লুটোনিয়াম কেন্দ্রীনে ৯৪ টি প্রোটন ও ১৪৫ টি নিউট্রন আছে। উদ্ধৃত নিউট্রনেরা ক্যাডমিয়াম দ্বারা শোষিত হয়ে যায়। ৯২$U^{২৩৫}$ বিভাজনকারী শ্লথ নিউট্রনের সংখ্যা, ৯২$U^{২৩৮}$ দ্বারা শোষিত শ্লথ নিউট্রনের সংখ্যা এবং ক্যাডামিয়াম দ্বারা শোষিত উদ্বৃত্ত নিউট্রনের সংখ্যা, এই তিনটি প্রক্রিয়াকে যদি ঠিকভাবে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় তবে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে শক্তি সৃষ্টিকারী স্বতঃস্ফুর্ত শৃঙ্খল বিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব। যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হলো তা প্রাকৃতিক এই প্রক্রিয়া নীচের ছবিতে দেখানো হলো, ৯২$U^{২৩৫}$ ও ৯২$U^{২৩৮}$ দু ধরণেরই কেন্দ্রীন আছে, ইউরেনিয়াম, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের মধ্যে



১৯ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়া।
ক। নিউট্রন খ। ৯২$U^{২৩৫}$ গ। দ্রুতগতিনিউট্রিন ঘ। গ্রাফাইট রড ঙ। শ্লথ নিউট্রন চ। ৯২$U^{২৩৮}$ কেন্দ্রীন শ্লথ নিউট্রন শোষণ করে প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত হয় ছ। ক্যাডমিয়াম রড অতিরিক্ত নিউট্রন শোষণ করে।

একটি শ্লথ নিউট্রন $_{৯২}U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনকে আঘাত করল ফলে তার বিভাজন হলো। সঙ্গে সঙ্গে নতুন দ্রুত গতিশীল নিউট্রনের সৃষ্টি হলো। গ্রাফাইট মডারেটারের সাহায্যে দ্রুতগতি নিউট্রনদের শ্লথ করিয়ে নেওয়া হলো। শ্লথ নিউট্রনদের মধ্যে কয়েকটি $_{৯২}U^{২৩৮}$ কেন্দ্রীন শোষণ করে নিল এবং প্লুটোনিয়াম কেন্দ্রীন তৈরী হলো। বাকী শ্লথ নিউট্রনেরা আরও $_{৯২}U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনকে বিভাজিত করল, বাকী শ্লথ নিউট্রনেরা ক্যাডমিয়াম দিয়ে শোষিত হয়ে গেল, এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।

৭ রিয়েকটার

রিয়েকটার ও তার ব্যবহার

যে যন্ত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীন বিভাজনকে তথা কেন্দ্রীন শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় তাকে বলা হয় কেন্দ্রীন রিয়েকটার। রিয়েকটারের মধ্যে যে সব জিনিষ পাওয়া যায় তা হলো তাপ, নিউট্রন ও পারমাণবিক বিকিরণ। এই তাপই শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। রিয়েকটারের ভেতরে ও বাইরে নিউট্রন বহু কাজে লাগে। রিয়েকটারের ভেতরে নিউট্রন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বস্তু তৈরী করে যাদের বলা হয় রেডিও আইসোটোপ। এই সব রেডিও আইসোটোপ শিল্পে, কৃষিকার্যে ও চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়। প্লুটোনিয়ামের মত নতুন মৌলিক বস্তু তৈরী করতেও এরা কাজে লাগে। রিয়েকটারের বাইরে নিউট্রনদের অণু, পরমাণু, কেন্দ্রীন, কেলাস (crystal) প্রভৃতির গঠন ও অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়। এছাড়া নিউট্রনদের মাথার ভেতরে টিউমার সারানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। রিয়েকটারের গায়ে একটা ছিদ্র করা হয়, এই ছিদ্র দিয়ে যেসব নিউট্রন বেড়িয়ে আসে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় গতিবেগ যাদের আছে তাদেরই এই সব কাজে ব্যবহার করা হয়।

রিয়েকটারের ভেতরে যে সব কেন্দ্রীন বিকিরণ থাকে তাদের মধ্যে আছে আলফা কণা, বিটা কণা, গামা রশ্মি প্রভৃতি। এদের বিশেষ কোন কাজে লাগানো যায় না। অন্য দিকে এরা স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন করতে পারে। তাই এরা যাতে রিয়েকটারের বাইরে বেড়িয়ে আসতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

রিয়েকটারের শ্রেনী বিভাগ

কি উদ্দেশ্যে রিয়েকটার ব্যবহার হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে রিয়েকটারের নমুনা ও নির্মান কৌশল। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যে রিয়েকটার, গবেষণার কাজে ব্যবহৃত রিয়েকটার বা চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত রিয়েকটার একে অপরের থেকে ভিন্ন হবে। প্রথম ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য হবে তাপ এবং তার সাহায্যে শক্তি পাওয়া, দ্বিতীয় ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনীয় গতি ও তীব্রতা নিয়ে নিউট্রন রশ্মি পাওয়া। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যে রিয়েকটার ব্যবহার করা হয় তাদেরও রকমফের থাকে। জ্বালানী, মডারেটার ও শীতল করার জন্য কি ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে রিয়েকটারের বিভিন্নতা।

রিয়েকটারের মূল অংশ

নমুনা বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন রিয়েকটারের মূল লক্ষ্য হলো সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে শৃঙ্খল বিক্রিয়া ঘটানো। এই হিসাবে বিভিন্ন রিয়েকটারে কতকগুলি অংশ একই থাকবে,

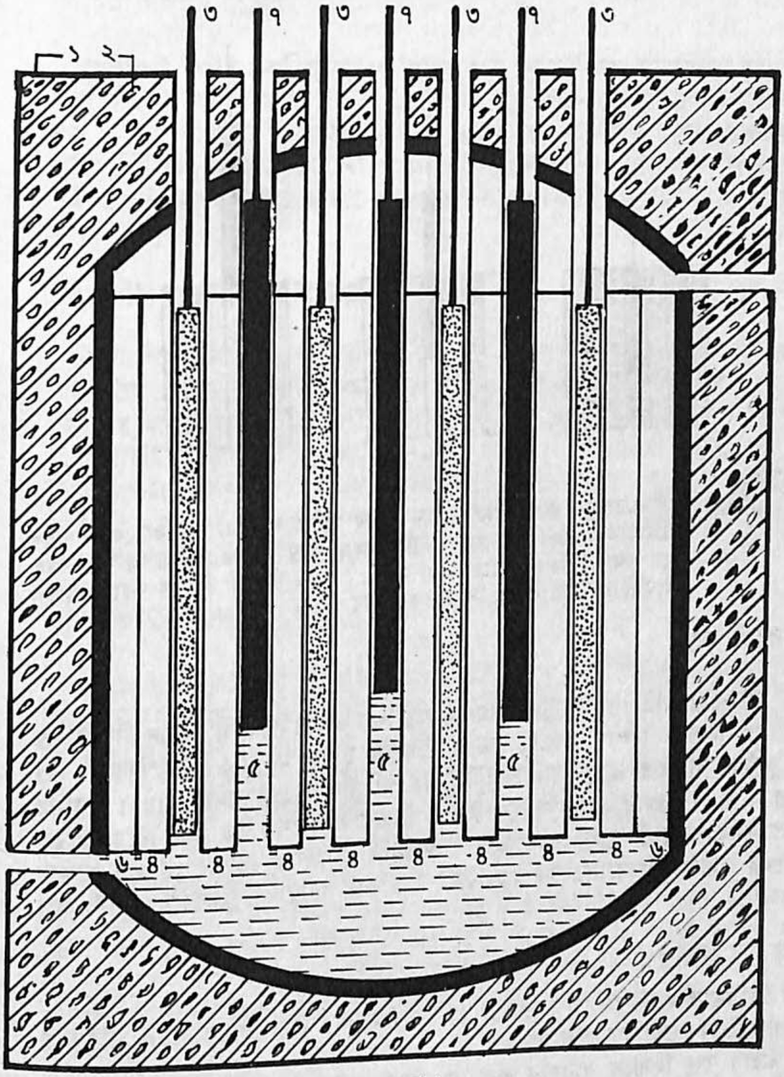
১। বিভাজনশীল জ্বালানী, ২। মডারেটার ৩। নিউট্রন নিয়ন্ত্রনকারী রড, ৪। ঠান্ডা করার জন্য ব্যবহৃত তরল বা গ্যাসীয় বস্তু (coolant)

রিয়েকটার জ্বালানী

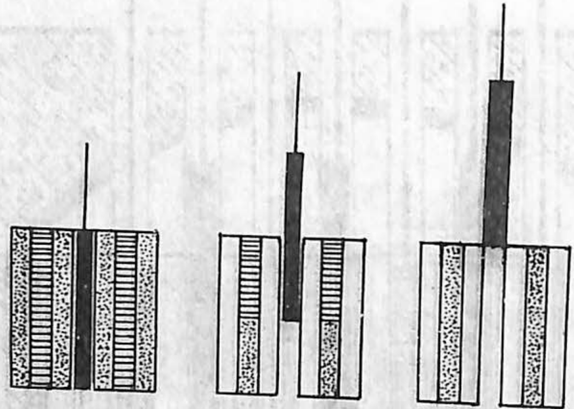
রিয়েকটারে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম আর বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম। বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম হলো পরিশোধিত প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম যেখানে বিভাজনযোগ্য ৯২$U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনের সংখ্যা বেশী। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে ৯২$U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীনের পরিমাণ বাড়ানো কমানো যায়। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম সস্তা ও ব্যবহার করতে সুবিধা। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে বিভাজন যোগ্য ৯২$U^{২৩৫}$ কেন্দ্রীন সংখ্যা কম হওয়ার দরুণ এর থেকে বেড়িয়ে আসা নিউট্রনের সংখ্যা বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করলে যে পরিমাণ নিউট্রন বেড়িয়ে আসে তার থেকে কম হবে। বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করলে বেশী নিউট্রন পাওয়া সম্ভব। এর সাহায্যে বহু ধরণের রিয়েকটার চালানো সম্ভব। এই জ্বালানী ব্যবহার করলে উৎপাদন বেশী হয় বলে এর ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী শীতল করার বস্তু ব্যবহার করতে হবে।

মডারেটার

রিয়েকটার যন্ত্রে যে সব মডারেটার ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে গ্রাফাইট ও ভারী জল অন্যতম। গ্রাফাইট খুব বিশুদ্ধ হওয়া দরকার কেননা গ্রাফাইটের মধ্যে যদি অন্য কিছু থাকে তবে তা নিউট্রন শোষণ করে রিয়েকটারের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। পরিশুদ্ধ গ্রাফাইট পাওয়া খুবই শক্ত কাজ। এই জন্য বহু রিয়েকটারে মডারেটার হিসাবে ভারী জল (D_2O) ব্যবহার করা হয়। ভারী জল খুব কমই নিউট্রন শোষণ করতে পারে। ভারী জল হলো ভারী হাইড্রোজেন ডিউটেরন ও অক্সিজেনের যৌগ। ভারী জলকে মডারেটার হিসাবে ব্যবহার করলে অনেক ধরনের শীতল করার প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যায়। কিছু কিছু রিয়েকটারে মডারেটার ব্যবহার করা হয় না। এই জন্য সেই সব রিয়েকটারে দ্রুতগতি নিউট্রন পাওয়া যায়। এই সব দ্রুতগতি নিউট্রন অন্য কেন্দ্রীন তৈরী করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এখানে জ্বালানী কম লাগে ও এদের বলা হয় ব্রিডার (Breeder) রিয়েকটার।



২০ একটি কেন্দ্রীন রিয়েকটারের মূল অংশ।
১। রিয়েকটার রাখার পাত্র। ২। কংক্রীটের আস্তরণ। ৩। কেন্দ্রীন জ্বালানী।
৪। মডারেটার। ৫। শীতল করার বস্তু। ৬। নিউট্রন প্রতিফলক।
৭। নিয়ন্ত্রনকারী দন্ড। ৮। নিউট্রন শোষণ করার দন্ড।



২১ নিউট্রন শোষণ করতে পারে এমন ধাতব দন্ডের সাহায্যে রিয়েকটারে বিভাজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করা হয়। নিয়ন্ত্রণকারী দন্ড ভিতরে ঢুকিয়ে বা বার করে এনে শৃঙ্খল বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শৃঙ্খল বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে রিয়েক্টার উদ্ভূত তাপও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

নিয়ন্ত্রণকারী দন্ড

শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় অতিরিক্ত নিউট্রন শোষণ করার জন্য ক্যাডমিয়াম বা বোরন নির্মিত দন্ড রিয়েকটারের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। উপরের ছবির মত (১৮) নিয়ন্ত্রণকারী দন্ড ভেতরে ঢুকিয়ে বা বার করে শোষিত নিউট্রনের পরিমাণ বাড়ান কমান যায়। শোষিত নিউট্রনের বাড়া বা কমার ওপর নিউট্রন রশ্মির তীব্রতা হের ফের হয় এবং রিয়েকটারের কার্যক্ষমতা সেই অনুযায়ী বাড়া কমা করে। দন্ডগুলি একেবারে ভেতরে ঢোকান থাকলে রিয়েরটারের কর্মক্ষমতা সবচেয়ে কম হয় এবং বার করে আনলে রিয়েকটারের **কার্যক্ষমতা** বেশী হয়।

শীতল করার পদ্ধতি

কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার দরুণ যে তাপ উৎপন্ন হয় তা কমানোর জন্য রিয়েকটারের চারিপাশে শীতল করার জিনিষ প্রবাহিত করা হয়।

শীতল করার বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা অন্য কোন গ্যাস, জল, তরল সোডিয়াম কিংবা তরল সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের মিশ্রণ। তরল ধাতুদের তাপমাত্রা অনেকদূর পর্যন্ত ওঠানো যায়। সেই কারণে তরল ধাতুরা বেশি পরিমাণে রিয়েকটারের তাপমাত্রা শোষণ করতে পারে। এই তাপ আবার উচ্চতাপমাত্রার (Super heated) জলীয় বাষ্প তৈরি করতে পারে। এই উষ্ণ জলীয় বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালানো সম্ভব। অবশ্য এই গলিত ধাতুরা বেশী নিউট্রন শোষণ করে ফলে বিক্রিয়ার হার কমে যেতে পারে। তবে বর্ধিত শক্তি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে এই অসুবিধা দূর করা যায়।

জ্বালানী ক্ষয়ের সমস্যা

শীতলকারী জিনিষ প্রবাহিত হলে (বিশেষ করে তা যদি উচ্চ তাপমাত্রার জল হয়) তার দ্বারা জ্বালানী দন্ডগুলি ক্ষয়ে যায়। এই ক্ষয়ের হাত থেকে জ্বালানী দন্ডগুলিকে রক্ষা করার জন্য জ্বালানী দন্ডগুলির উপর জারমেনিয়াম আস্তরণ দেওয়া থাকে। জারমেনিয়াম ক্ষয় পায় না বা নিউট্রন শোষণও করে না। জ্বালানী দন্ডকে আস্তরণ দিলে বিভাজনযোগ্য কেন্দ্রীন গুলি জ্বালানী দন্ডের বাইরে আসতে পারে না। ফলে তারা শীতলকারী বস্তুর সংস্পর্শে আসে-না।

রিয়েকটারের বিকিরণ সমস্যা

কেন্দ্রীন রিয়েকটারে যে সব বিকিরণ বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তারা মূলতঃ বিটা ও গামা রশ্মি। গামা রশ্মির ভেদ করার ক্ষমতা খুব বেশি এবং তারা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। এইসব রশ্মিদের রিয়েকটারের বাইরে আসতে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। এই জন্য সমস্ত রিয়েকটারটি সিমেন্টের দেওয়াল দিয়ে ঢাকা থাকে। সিমেন্টের দেওয়ালের চারিপাশে সীসার একটা স্তর থাকে। কোন বিকিরণ এর বাইরে আসতে পারে না। যে বাড়িতে রিয়েকটার বসানো থাকে তাতে বহু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বসানো হয় যাতে সাবধানতা সত্ত্বেও কোন বিপজ্জনক রশ্মি বেড়িয়ে আসছে কিনা ধরা যায়।

নিয়ন্ত্রিত তাপ কেন্দ্রীন শক্তি

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভাজন রিয়েকটার তৈরী হয়েছে। এই সব রিয়েকটার থেকে নানান কাজে শক্তি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সংযোজন রিয়েকটার কোথাও তৈরী হয়নি। এর কারণ দুটি –

(১) সংযোজন প্রক্রিয়া ঘটতে গেলে খুব বেশি তাপ মাত্রার দরকার।

(২) একবার সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে দ্রুতগতিতে ঘটে যাওয়া শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে ও তার ফলে বেড়িয়ে আসা প্রচন্ড শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই দুরূহ কাজ। সুতরাং সংযোজন রিয়েকটার তৈরি করার ব্যাপারে বিরাট অসুবিধা আছে। অগ্রসর দেশে চেষ্টা চলেছে এসব বাধা অতিক্রম করার। কিছু কিছু সাফল্যও যে অর্জন করা যায় নি তা নয়। কোন কোন গবেষণাগারে ৫ মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। তবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তাপ কেন্দ্রীন শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আরেও অনেক পথ যেতে হবে। যখন এটা সম্ভব হবে তখন প্রাচুর্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

৮ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনকারী রিয়েকটার ও শক্তি প্রকল্প

কেন্দ্রীন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীন চালিত রিয়েকটার বসানো থাকে যা চুল্লী হিসাবে কাজ করে। আর থাকে বাষ্প উৎপাদন করার ব্যবস্থা, ষ্টীম টারবাইন ও জেনারেটার। এখন জ্বালানী অনুযায়ী নানান ধরণের রিয়েকটার হয়।

প্রাকৃতিক্ ইউরেনিয়াম রিয়েকটার

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে সব রিয়েকটার ব্যবহার করা হয় তার জ্বালানী, মডারেটার এবং শীতলকারী বস্তুগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হতে হবে। ইংল্যান্ডে ক্যালডার হল রিয়েকটারে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম (জ্বালানী) গ্রাফাইট (মডারেটার) ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড (শীতলকারী বস্তু) ব্যবহার করা হয়। শীতলকারী গ্যাস গরম হয়ে বেড়িয়ে আসার পর এর দ্বারা জল থেকে বাষ্প তৈরী করা হয়। এই বাষ্পই আবার পরিচিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে। রাজস্থানের রাণা প্রতাপসাগর রিয়েকটারটি এমনভাবে তৈরী যাতে সে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ও ভারী জল ব্যবহার করতে পারে। আমাদের পরমাণু কমিশনের নীতি হলো আরও এ ধরণের রিয়েকটার তৈরী করা।

বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম রিয়েকটার

যেখানে বিশুদ্ধকরণ করে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম তৈরী করা সম্ভব সেখানে জ্বালানী হিসাবে বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। যে সব রিয়েকটারে এই জ্বালানী ব্যবহার করা হয় তারা অনেক বেশী কার্যকরী। এদের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী শীতলকারী বস্তু ব্যবহার করতে হয়। এদের থেকে অনেক বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। মহারাষ্ট্রের তারাপোরে যে রিয়েকটার আছে সেখানে বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় এবং তা আনা হয় আমেরিকা থেকে।

ফুটন্ত জল রিয়েকটার

কিছু কিছু রিয়েকটারে বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং শীতলকারী বস্তু হিসাবে জল ব্যবহার করা হয়। এই জল উচ্চচাপে বাষ্পে পরিণত করা হয়। এই বাষ্প সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে তাপ হস্তান্তরের কোন ব্যবস্থা দরকার হয় না। একে বলা হয় ফুটন্ত জল রিয়েকটার।

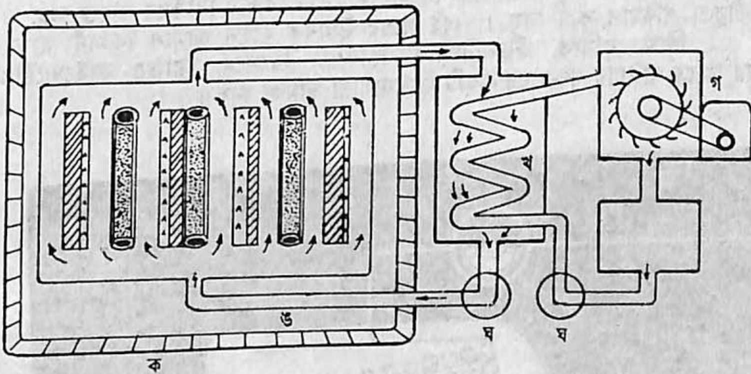
উচ্চ-চাপ সমন্বিত-জল রিয়েকটার

অনেক রিয়েকটারে জলকে উচ্চচাপে রেখে শীতলকারী তরল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে জলকে ১০০°C এর অনেক বেশী তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। উচ্চচাপে প্রবহমান গরমজল তাপ হস্তান্তর যন্ত্রে নিম্নচাপ বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প টারবাইনের মধ্যে চালনা করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। এখানেও জ্বালানী হিসাবে বর্ধিতশক্তি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। এই রিয়েকটারকে বলা হয় উচ্চচাপ-বিশিষ্ট-জল রিয়েকটার।

তরলধাতু সমন্বিত রিয়েকটার

কিছু কিছু বর্ধিত শক্তি ইউরেনিয়াম রিয়েকটারে তরল সোডিয়াম বা তরল সোডিয়াম পটাশিয়াম মিশ্রণকে শীতলকারী বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মডারেটার হিসাবে থাকে গ্রাফাইট। এই ধরণের রিয়েকটারে থাকে – (১) মূল অংশ অর্থাৎ যেখানে কেন্দ্রীন জ্বালানী থাকে, (২) তাপ হস্তান্তর করার যন্ত্র, (৩) টারবাইন, (৪) বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র বা জেনারেটার।

গলিত ধাতু বা ধাতু মিশ্রণ রিয়েকটার-এর মধ্যে দিয়ে পাম্প করা হয়। এতে এই তরল খুব বেশী মাত্রায় গরম হয়। উত্তপ্ত গরম ধাতুকে তখন তাপ হস্তান্তর যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। তরল উষ্ণ ধাতু থেকে তাপ গ্রহণ করে জল উষ্ণ বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প টারবাইন ও জেনারেটারে নিয়ে যাওয়া হয় ফলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে জলে পরিণত হলে তাকে বয়লারের মাধ্যমে আবার উষ্ণ বাষ্পে পরিণত করা হয়। তাপ হস্তান্তর যন্ত্রে উষ্ণ তরলধাতুর তাপ আবার জলকে বাষ্পে পরিণত করে। ঠাণ্ডা তরল ধাতুকে আবার রিয়েকটারের মধ্যে উত্তপ্ত হবার জন্য পাঠানো হয়। এই চক্র চলতেই থাকে।



২২ কেন্দ্রীন শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন।
(ক) রিয়েকটার।
(খ) তাপ হস্তান্তর যন্ত্র।
(গ) টারবাইন ও জেনারেটার।
(ঘ) পাম্প।
(ঙ) শীতলকারী তরলধাতু।

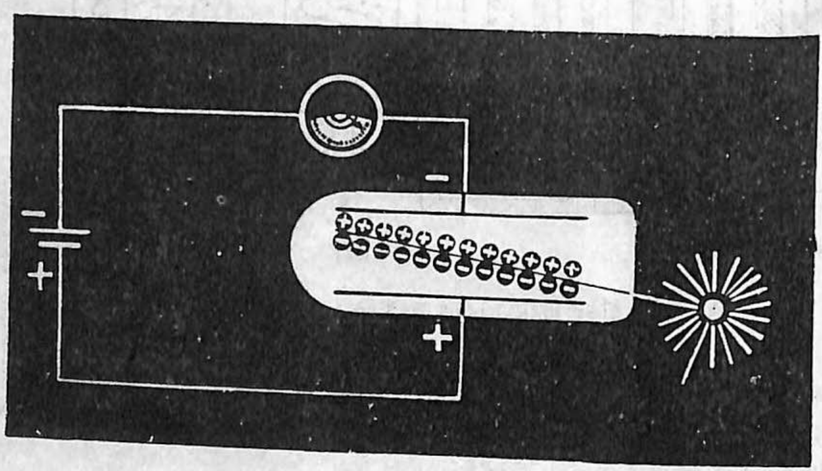
৯ গাইগার গণক যন্ত্র

কেন্দ্রীন বিকিরণের প্রকৃতি

শিল্পে, কৃষিতে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে কেন্দ্রীন শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে গেলে যে যন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রীন বিকিরণ সনাক্ত করা ও পরিমাপ করা হয় তার সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া ভাল। তেজস্ক্রিয় পরমাণু কেন্দ্রীন (যেমন রেডিয়াম বা ইউরেনিয়াম) আলফা কণা, বিটাকণা ও গামারশ্মি নির্গত করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভেঙ্গে যায়। আগেই বলা হয়েছে যে আলফাকণারা ধনাত্মক আধানযুক্ত হিলিয়াম কেন্দ্রীন যাতে দুটো প্রোটন ও দুটো নিউট্রন আছে। বিটা কণারা হলো ঋণাত্মক তড়িতাধানযুক্ত ইলেকট্রন বা ধনাত্মক তড়িতাধান যুক্ত পজিট্রন। এরা খুব বেশী গতিবেগ নিয়ে চলে। এদের গতিবেগ প্রায় আলোর গতিবেগের সমান। গামা-রশ্মি রঞ্জন রশ্মির মতন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে রঞ্জন রশ্মির চেয়ে গামা রশ্মির ভেদ করার ক্ষমতা অনেক বেশী। আলফা কণা বা বিটা কণার চেয়ে গামা রশ্মি অনেক বেশী ক্ষতিকারক। মানুষের শরীরে ঢুকলে এরা অনেক বেশী ক্ষতি করতে পারে। উচ্চশক্তি সম্পন্ন গামারশ্মি প্রায় কুড়ি সেন্টিমিটার পুরু সীসার পাতকে ভেদ করে যেতে পারে। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পরমাণুই হোক বা মানুষের তৈরী রেডিও আইসোটোপই হোক সকলেই তিন ধরণের রশ্মি নির্গত করে।

গাইগার গণক যন্ত্র

গাইগার গণক যন্ত্র একটা খুব সরল কৌশল যার সাহায্যে কেন্দ্রীন বিকিরণ সনাক্ত করা ও তাদের তীব্রতা পরিমাপ করা যায়। এই যন্ত্রের উদ্ভাবক হলেন জার্মান বিজ্ঞানী হ্যানস্ গাইগার। শিল্পে, কৃষিতে, জীবনবিজ্ঞানে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, রেডিও আইসোটোপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাইগার গণক যন্ত্র একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।



২৩ গাইগার গণক যন্ত্র।

গাইগার গণক যন্ত্রের মধ্যে ধাতুর তৈরী একটি ছোট চোঙ থাকে। এই চোঙের দুটি তার আছে। এই তার ও ধাতব চোঙ একটি কাচের নলের মধ্যে ঢোকান থাকে। এই নলের মধ্যে নিম্নচাপে আরগন গ্যাস ভরা থাকে। চোঙ ও তার পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তার দুটি উচ্চ বিভব সম্পন্ন ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। একটি তার ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত ও অপরটি ঋণাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই বর্তনীতে একটি পরিমাপক যন্ত্র লাগানো থাকে। গাইগার গণকযন্ত্রের মূল কথা হলো নিম্নচাপে বিদ্যুৎক্ষরণ। এখানে একটি তার হলো এ্যানোড ও অপর একটি হলো ক্যাথোড।

যখন আলফা কণা, বিটা কণা বা গামা রশ্মি গাইগার গনক যন্ত্রে ঢোকে তখন তা গণক যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো পরিমাপক যন্ত্রে ধরা পরে। এর কারণ হলো বিকিরণ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কাচনলের ভেতরকার গ্যাস আয়নিত হয়ে যায়। ক্যাথোড ও এ্যানোডের মধ্যে উচ্চ বিভব প্রভেদ থাকায় বর্তনীটি সম্পূর্ন হয়ে বিকিরণের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এইভাবে তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে যে বিকিরণ বেরোচ্ছে তার সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই ভাবে গাইগার গণক যন্ত্র যে কেবল কেন্দ্রীন বিকিরণ সনাক্ত করে তা নয় বিকিরণের তীব্রতা, তেজস্ক্রিয় বস্তুর উপস্থিতি ও তার সম্ভাব্য প্রকৃতিও নির্ধারণ করে।

গাইগার গণক যন্ত্রের কার্যপ্রণালী

তার দুটির মধ্যে বিভব প্রভেদ থাকে প্রায় ১০০০ ভোল্ট বা তার বেশী। এই বিভব প্রভেদ তড়িৎ ক্ষরনের পক্ষে উপযুক্ত। গণক যন্ত্রে কোন বিকিরণ প্রবেশ না করলে গ্রাহক যন্ত্রে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে আলফা কণা, বিটা কণা, বা গামা রশ্মি গণক যন্ত্রে প্রবেশ করে সেই মুহূর্তে অবস্থাটা একেবারে পাল্টে যায়। এই সব বিকিরণ আর-গন পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বার করে দেয়। এই বেড়িয়ে আসা ইলেকট্রন আবার অন্য পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বার করে দেয়। এই বেড়িয়ে আসা ইলেকট্রন আবার অন্য পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বার করে দেয়। এই অবস্থাটা চলতেই থাকে আর বেশী সংখ্যায় ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে পড়ে। এই ইলেকট্রনের ধনাত্মক সরু তরের দিকে ধাবিত হয়। এই দ্রুতগতি ইলেকট্রনদের জন্য একটি তাৎক্ষনিক তড়িৎ ক্ষরন হয়। এই তড়িংক্ষরন গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই যন্ত্রের সাহায্যেই বোঝা যায় যে গণক যন্ত্রে একধরণের বিকিরণ প্রবেশ করেছে। তড়িৎক্ষরনের সময় খুবই কম, এটি শেষ হয়ে গেলে গণক যন্ত্র পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে আর পরবর্ত্তী বিকিরণের সনাক্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়। পরবর্তী বিকিরণের উপস্থিতিও শব্দ দ্বারা ঘোষিত হবে। এই ভাবে গণক যন্ত্র প্রতিবার বিকিরণকে উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। অনেক গণক যন্ত্রে লাউডস্পীকারের বদলে নির্দেশক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। যখন গণক যন্ত্রে বেশী পরিমাণ বিকিরণ এসে পড়ে তখন শব্দের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে তাদের গোনা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময় গোনার জন্য আলাদা ইলেকট্রনিক কৌশল অবলম্বন করা হয়। তড়িৎক্ষরণের সময় কমিয়ে আনার জন্য অনেক সময় আরগনের সঙ্গে এ্যালকোহল বাষ্প মিশিয়ে দেওয়া হয় ও তড়িৎদ্বারের মধ্যেকার বিভবপ্রভেদ পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়।

১০ শিল্প ও কৃষিতে কেন্দ্রীন শক্তির ব্যবহার

যে জিনিষটার মাধ্যেমে শিল্পে ও কৃষিতে কেন্দ্রীন শক্তি আপন প্রভাব বিস্তার করেছে তার নাম হলো রেডিও আইসোটোপ। প্রানীবিদ্যায়, চিকিৎসাবিদ্যায়, যেমন মাইক্রোস্কোপ, পদার্থ বিজ্ঞানে যেমন স্পেকট্রোস্কোপ, জ্যোর্তিবিজ্ঞানে যেমন টেলিস্কোপ তেমনি রেডিও আইসোটোপও গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ পর্যন্ত প্রায় ১,৩০০ টি প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম রেডিও আইসোটোপ তৈরি হয়েছে।

রেডিও আইসোটোপ কি ও কী ভাবে তারা তৈরী হয়

রেডিও আইসোটোপ হলো মৌল বস্তুদের আইসোটোপ। তবে এরা প্রত্যেকেই তেজস্ক্রিয়, কৃত্রিম উপায়ে রেডিও আইসোটোপ তৈরি করা যায়। যে মৌলিক বস্তুর রেডিও আইসোটোপ তৈরী করা হবে তার সামান্য পরিমাণ কেন্দ্রীন রিয়েকটারে রাখা হয়। মৌলিক বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী এই রিয়েকটারে রাখার সময়কাল নির্ধারণ করা হয়। রিয়েকটারের ভেতরে রাখা মৌলিক বস্তুগুলি নিউট্রন শোষণ করে ফলে তাদের পারমণবিক ভর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা ঠিকই থাকে। এই ভাবে মৌলিক বস্তুটির আই সোটোপ তৈরি হয়ে যায়। এই আইসোটোপ গুলি তেজস্ক্রিয়। সাধারণ সোডিয়াম বা সোডিয়াম-২৩ এই ভাবে একটি নিউট্রন শোষণ করে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম-২৪ (পারমাণবিক ভরসংখ্যা - ২৪) এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। আইওডিন –১২৭ হলো সাধারণ আইওডিন কিন্তু এটা নিউট্রন শোষণ করে আইওডিন ১৩১ এ পরিণত হয় তখনই সেটা তেজস্ক্রিয়। ফসফরাস ৩১ সাধারণ কিন্তু ফসফরাস - ৩২ তেজস্ক্রিয়। কোবাল্ট - ৫৯ হলো সাধারণ কোবাল্ট আর কোবাল্ট ৬০ হলো তার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, এই আইসোটোপটি ক্যানসার চিকিৎসায় লাগে।

$$ {}_{২৭}Co^{৫৯} + {}_{0}n^{১} \rightarrow {}_{২৭}Co^{৬০} + \gamma $$

তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট   গামারশ্মি

এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে গামারশ্মি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হওয়াতে তার কোন তড়িতাধান নেই।

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন মৌলবস্তুর ৬০০ বেশী রেডিও আইসোটোপ কৃত্রিম ভাবে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। নিত্য নতুন আইসোটোপ প্রতিদিন তৈরী হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে যে কোন মৌলিক বস্তুকেই কেন্দ্রীন রিয়েকটারের ভেতরে কিংবা সাইক্লোট্রন যন্ত্র ব্যবহার করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত করা যায়।

এই সব আইসোটোপের সুবিধা হলো এই যে এরা খুব অল্প সময়ের জন্য তেজস্ক্রিয় থাকে। অল্প সময়ের জন্য অল্প পরিমাণে এদের ব্যবহার করা চলে। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকারক নয় এমন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কৃষিতে আইসোটোপের ব্যবহার

রেডিও আইসোটোপ কৃষি বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত । এর সাহায্যে আমরা জটিল সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিকে ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। রেডিও আইসোটোপের সাহায্যে গাছ পালার পুষ্টি, উদ্ভিদ হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক, কীটনাশক যৌগের ব্যবহার, গরজীবী ও ছত্রাকদের সম্বন্ধে আমরা বহু তথ্য জানতে পেরেছি । গাছপালার পুষ্টি এবং সে ব্যাপারে কৃত্রিম সারের ভূমিকা জানার প্রধান উপায়ই হলো রেডিও আইসোটোপের ব্যবহার । অধিক ফলনের জন্য নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস ঘটিত সার ব্যবহার করা হয় । এই সব সারের সংগে এদের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে গাছ কোন সার, কোন সময়ে ও কি পরিমাণ ব্যবহার করছে তা বোঝা যায় । এর থেকে ঠিক করা হয় যে কোন গাছে কোন সময়ে কি সার দেওয়া হবে ।

সালোকসংশ্লেষই হলো পৃথিবীতে সমস্ত জীবনের মূলসূত্র । কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল এবং সূর্যালোকের সাহায্যে গাছ শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে । $C^{১৪}$ এবং $O^{১৭}$ ও অন্যান্য রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করে দেখা গেছে সালোকসংশ্লেষের সময় যে অক্সিজেন বেরোয় তা মূলরোমের দ্বারা শোষিত জল থেকে আসে আরও জানা গেছে যে ফলের মধ্যে যে শর্করা থাকে তা আলো পাবার কয়েক সেকেন্ড পরেই তৈরী হয় । যদি কোন গাছকে লাল, হলুদ আলোর দ্বারা আলোকিত করা হয় তাহলে কেবল শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন হয়, আবার নীল আলো ব্যবহারে এ্যালকোহল তৈরী হয় ।

শিল্পে আইসোটোপের ব্যবহার

(ক) পারমাণবিক পাইল (atomic pile)

পারমাণবিক পাইল এমন এক ধরণের যন্ত্র যেখানে তেজস্ক্রিয়তার দরুণ পাওয়া শক্তিকে সরাসরি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় । কি ভাবে শক্তি রূপান্তরিত হবে তার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরণের পারমাণবিক পাইল তৈরী করা যায়

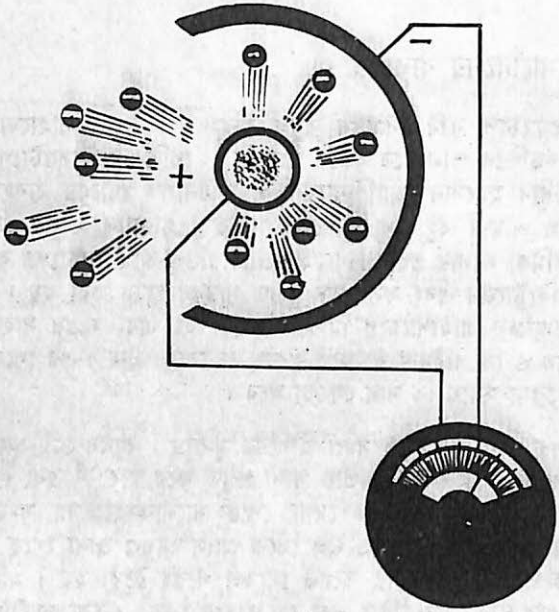
১। বিটা রশ্মির উৎসকে একটি ফাঁপা ধাতব গোলকের মধ্যে রাখা হয় ফলে উৎস ও গোলকের মধ্যে বিভব প্রভেদ সৃষ্টি (Potential difference) হয় । এই অবস্থায় ধাতব গোলক ও উৎস পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় ।

২। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে কোন গ্যাসের পরমাণুগুলিকে আয়নিত করে সেই আয়নিত পরমাণুর সাহায্যে তড়িত প্রবাহের সৃষ্টি করা ।

৩। দুটি অর্ধপরিবাহীর সংযোগস্থল (np) বিকিরণের প্রভাবে তড়িতের উৎস হিসাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে ।

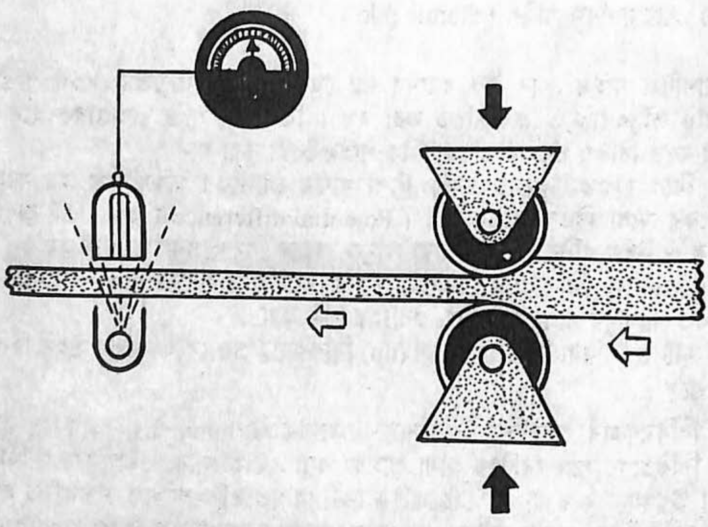
৪। বিকিরণকারী তেজস্ক্রিয় বস্তুর সামনে আলোকপ্রভ (luminous) কোন বস্তু রাখা হয় । বিটা বিকিরণের সঙ্গে বেড়িয়ে আসা আলফা কণা এই আলোকপ্রভ বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে আলো উৎপাদন করে বা ফটোইলেকট্রিক কোষের মত তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয় ।

এই সব বিভিন্ন ধরণের পাইল বহু বেতার যন্ত্রে শক্তি জোগানোর কাজে ব্যবহার করা হয় । কি ধরণের বিকিরণের উৎস ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে এই সব পারমাণবিক পাইল কুড়ি থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে । মনে রাখতে হবে যে পারমাণবিক পাইলের সাহায্যে ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব নয় ।



২৪ পারমাণবিক পাইল

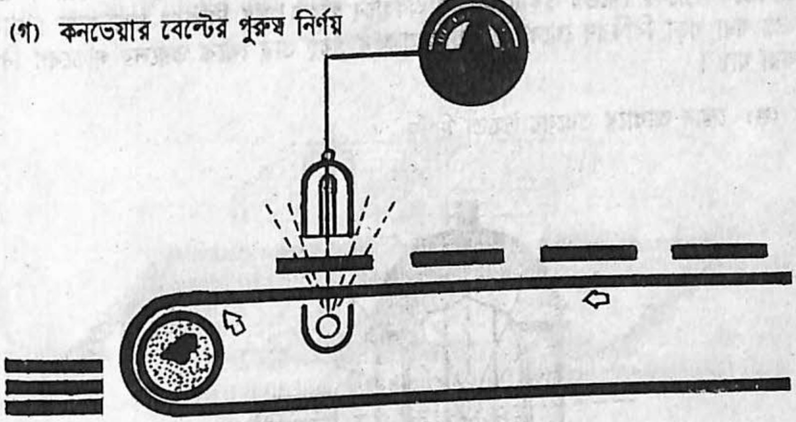
(খ) কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে বাহিত বস্তুর সংখ্যা গণনা



২৫ কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে বস্তুর সংখ্যা গণনা ।

ছবিতে দেখানো হয়েছে যে গাইগার গণক যন্ত্রের ও উৎসের মাঝখানে কনভেয়ার বেল্টটি চালনা করা হয়। বেল্টের ওপরে রাখা বস্তু যখনই গণক যন্ত্রের ও উৎসের মাঝখান দিয়ে যায় তখন বিকিরণের হ্রাস ঘটে আর সেটা বোঝা যায় গ্রাহক যন্ত্র থেকে। এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং যন্ত্রে কাজে লাগানো হয়। যে কয়টি জিনিষ ভরে প্যাকিং করতে হবে সেই সংখ্যাটি সম্পূর্ণ হলেই স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং যন্ত্রটি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

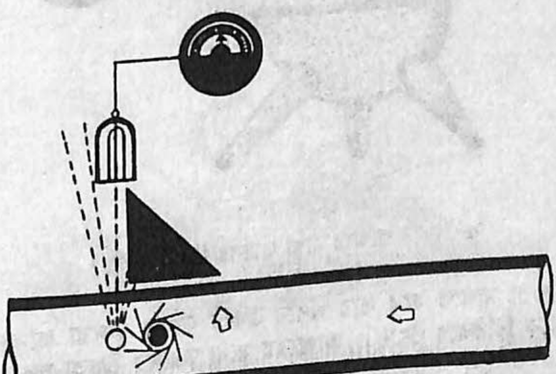
(গ) কনভেয়ার বেল্টের পুরুত্ব নির্ণয়



২৬ কনভেয়ার বেল্টের পুরুত্ব নির্ণয়

আগের মত গাইগার গণক যন্ত্র এবং বিকিরণের উৎসের মাঝখান দিয়ে কনভেয়ার বেল্টটি চালনা করা হয়। গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়া বিকিরণের তীব্রতার পরিমাণ নির্ভর করবে বেল্টের পুরুত্বের ওপর। সুতরাং গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়া বিকিরণের তীব্রতা দেখে কনভেয়ার বেল্টের পুরুত্ব কম কি বেশী বোঝা যাবে।

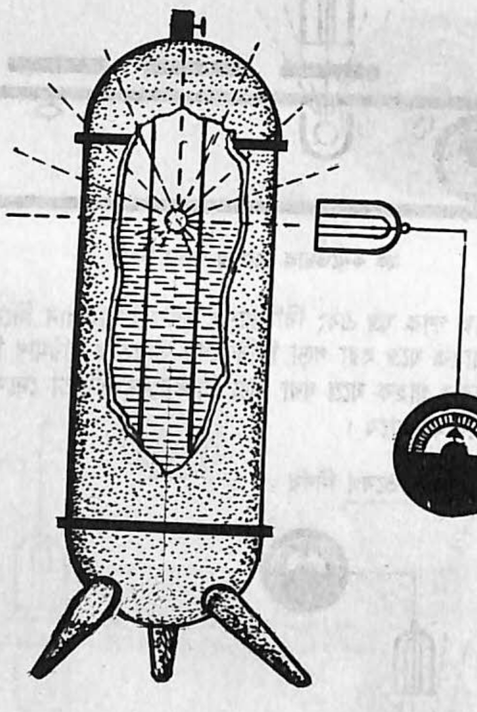
(ঘ) কোন তরল বস্তুর গতিবেগ নির্ণয়



২৭ তরলের গতিবেগ নির্ণয়

একটি বিশেষ ধরণের পাখা বা ফ্যান যে টিউবের মধ্যে দিয়ে তরল যাচ্ছে সেখানে রাখা হয়। এই ফ্যানের একটি ব্লেডে তেজস্ক্রিয় বস্তু রাখা হয়। এই উৎস ও গণক যন্ত্রের মাঝখানে একটি সীসার খন্ড থাকে। সীসার খন্ডটি বিকিরণ শোষণ করতে পারে। এটি এমনভাবে রাখা হয় যার ফলে ফ্যানের ব্লেডের একটি বিশেষ অবস্থানেই কেবল মাত্র বিকিরণ গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। তরল বস্তু টিউবের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকলে ফ্যানটিও ঘুরতে থাকে। তরল বস্তুর গতিবেগের ওপর ফ্যানটির আবর্তন নির্ভর করে। প্রতি আবর্তনে ফ্যানের ব্লেডের একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থানে গ্রাহক যন্ত্রে বিকিরণ ধরা পড়ে। গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়া বিকিরণ থেকে ফ্যানটির আবর্তন এবং তার থেকে তরলের গতিবেগ নির্ণয় করা যায়।

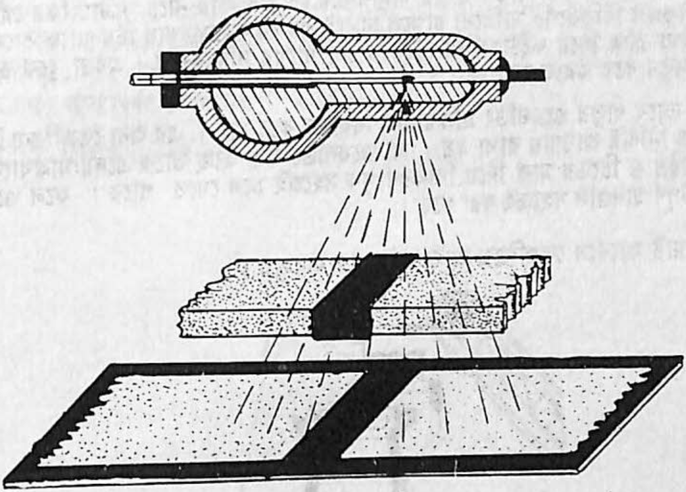
(ঙ) কোন আধারে তরলের উচ্চতা নির্ণয়



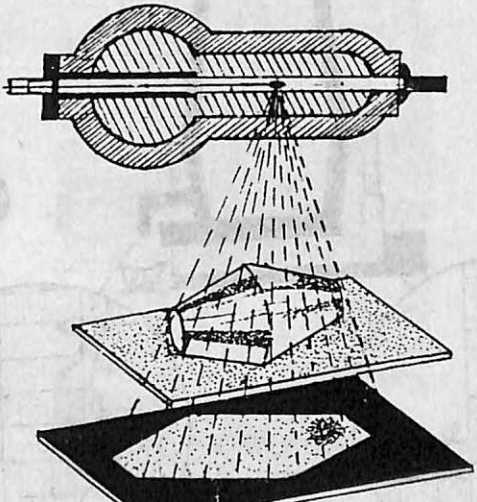
২৮ কোন আধারে রাখা তরলের উচ্চতা নির্ণয়।

যে তরলের উচ্চতা মাপতে হবে তার ওপরে একটি কর্কের টুকরো ভাসান হয়। এই কর্কের ওপরে থাকে বিকিরণে উৎস। আধারের মধ্যে তরলের উচ্চতা যত পরিবর্তিত হবে ততই গ্রাহক যন্ত্রেরও স্থান পরিবর্তন করতে হবে। সুতরাং গ্রাহক যন্ত্রের অবস্থা থেকে তরলের উচ্চতা পরিমাপ করে নেওয়া যায়।

(চ) ধাতু ঢালাই ও ওয়েলডিং এর কাজে গামা রশ্মি



২৯ ওয়েলডিং-এর কাজে গামারশ্মি ।

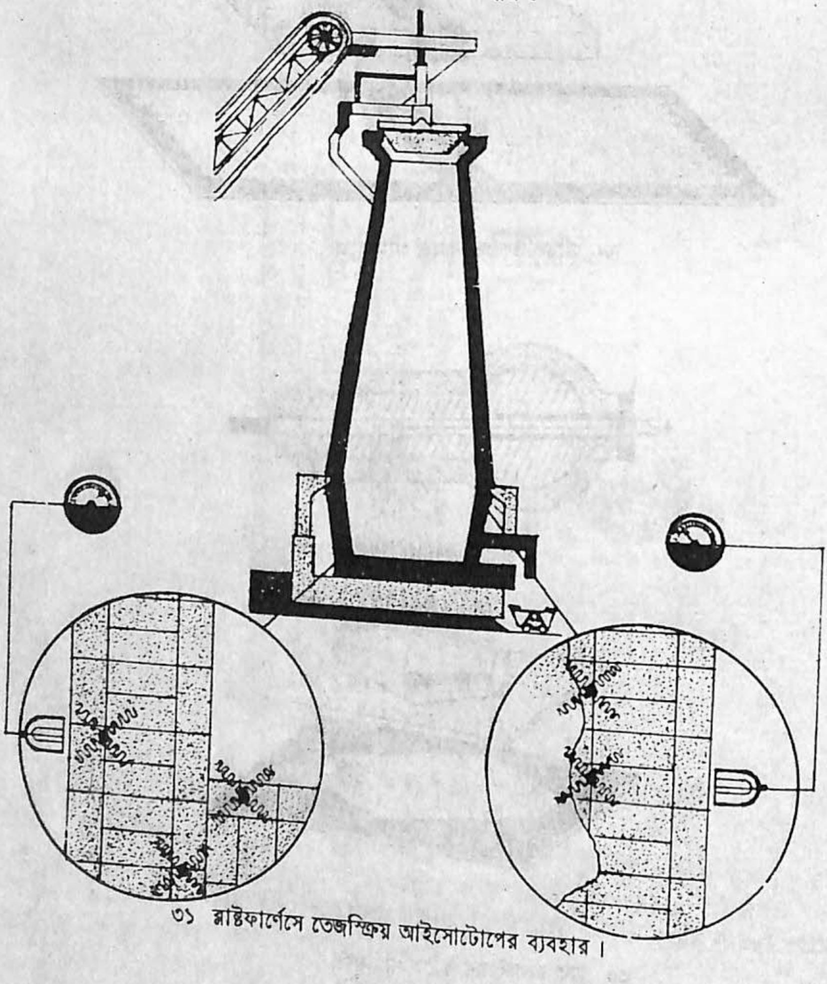


৩০ ধাতু ঢালাইয়ের কাজে গামারশ্মি ।

ধাতু ঢালাই করার সময় ঢালাই সব সময় সুষম হয় না। কিছু কিছু ছিদ্র ও চিড় থেকেই যায়। ছিদ্র বা চিড় থাকলে ঢালাইটি পড়ে ভেঙে যেতে পারে। ছিদ্র বা চিড় আছে কিনা দেখার জন্য ঢালাই করা ধাতুর ওপরে গামারশ্মির উৎস ও তার নীচে ফটোগ্রাফির প্লেট রাখা হয়। কিছুক্ষণ বিকিরণের সান্নিধ্যে রাখলে ঢালাই এর যে সব জায়গায় ছিদ্র আছে তাদের মধ্য দিয়ে গামা রশ্মি গিয়ে ফটোগ্রাফির প্লেটে কালো দাগের সৃষ্টি করবে। অবস্থা বুঝে ঢালাইটি আবার নতুন করে করতে হবে।

একই ভাবে ধাতুর ওয়েলডিং প্রক্রিয়াটিও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এর জন্য তেজস্ক্রিয় উৎস ও গণক যন্ত্র নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয়। যা ওয়েলডিং করা হচ্ছে তাকে এদের মাঝখানে রাখা হয়। ছিদ্র ও চিড়ের মাঝ দিয়ে বিকিরণ খুব সহজেই চলে যেতে পারে। ফলে ওয়েলডিং এর ত্রুটিপূর্ণ স্থানগুলি সহজেই ধরা পড়ে।

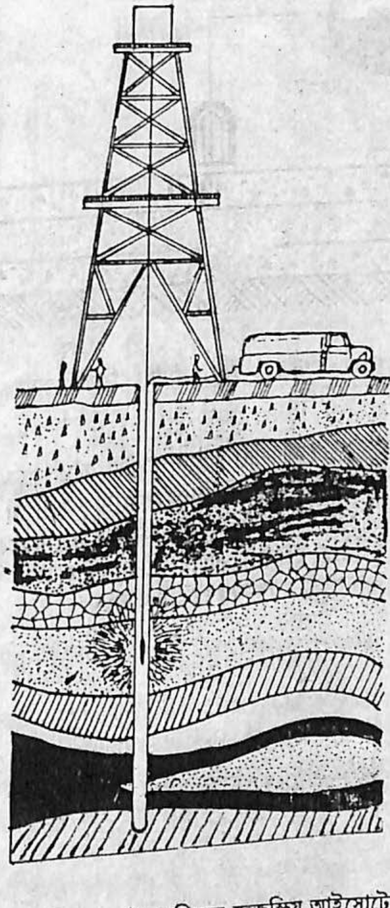
(ছ) ব্লাষ্ট ফার্নেসে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ঃ



৩১ ব্লাষ্টফার্নেসে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার।

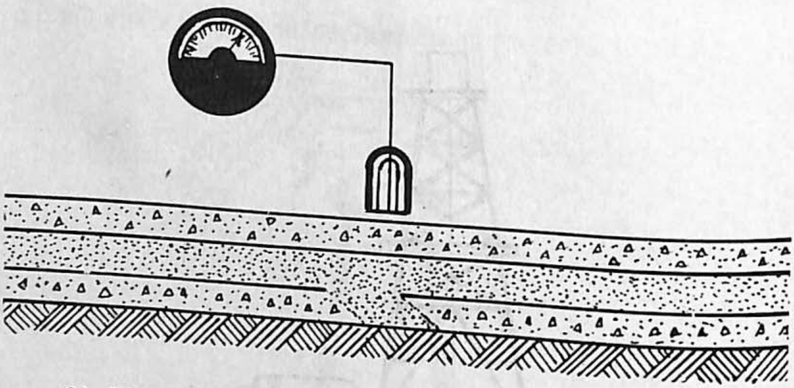
ব্লাষ্ট ফার্ণেসের গায়ে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারে এমন জিনিষের আস্তরণ দেওয়া থাকে। এই আস্তরণের মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কিনা তা জানার জন্য গামারশ্মি ব্যাবহার করা হয়। এজন্য আস্তরণের ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় তেজস্ক্রিয় উৎস রাখা হয়। (কোবাল্ট-৬০)। এ সব জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসা বিকিরণের তীব্রতা গণক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। যখন গলিত ধাতু আস্তরণের প্রথম স্তরটির ক্ষতিসাধন করে তখন প্রথম স্তরে রাখা তেজস্ক্রিয় উৎসটি দূরে সরে যায় ফলে গণক যন্ত্রে ধরা তীব্রতার পরিমাণও কমে যায়। এই ভাবে অগ্নি প্রতিরোধক আস্তরণের কোন স্তর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ তা নির্ণয় করা যায়।

(জ) ভূ-বিজ্ঞান ও তৈল শিল্পের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ



৩২ ভূ-বিজ্ঞান ও তৈল শিল্পের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

ভূ-বিজ্ঞানে ও তেল অনুসন্ধানের কাজে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে কি কি রাসায়নিক পদার্থ আছে তা রেডিও আইসোটোপের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বার করতে পারেন যদিও পদ্ধতি গুলি খুবই জটিল। মোটামুটি একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে দ্রুতগামী নিউট্রন সন্নিহিত অঞ্চলে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি করে। এই তেজস্ক্রিয়তার চরিত্র থেকে বিজ্ঞানীরা সেখানে কি ধরণের রাসায়নিক বস্তু আছে তা নির্ধারণ করতে পারেন। তেল অনুসন্ধানের জন্য সামান্য তেলের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মিশিয়ে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। যদি নীচে তেল থাকে তাহলে সেখানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এই ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা গণক যন্ত্রে ধরা যাবে ও অনুসন্ধানের জায়গায় তেল আছে কিনা বোঝা যাবে।

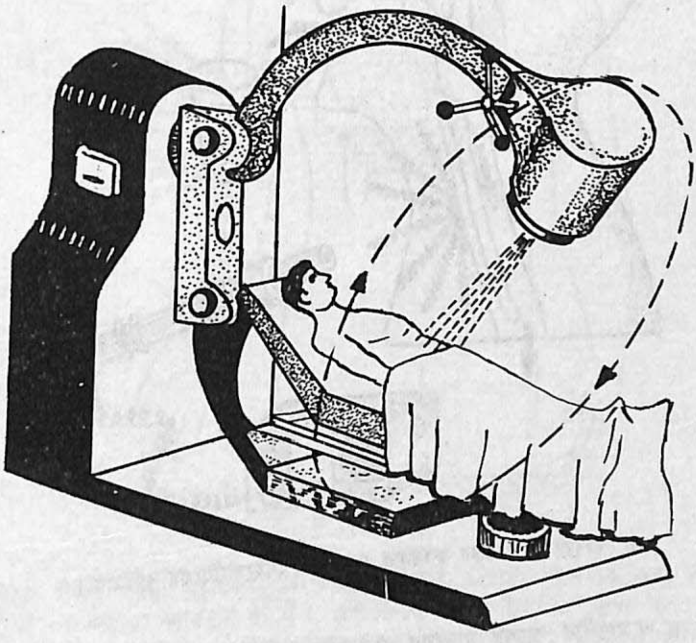


৩৩ তেল বা জলের পাইপে ছিদ্র আছে কিনা অনুসন্ধানের কাজে রেডিও আইসোটোপের ব্যাবহার।

জল বা তেলের পাইপে ছিদ্র হলে তা খুজে পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে। এর জন্য তেল বা জলের সঙ্গে রেডিও আইসোটোপ মিশিয়ে দেওয়া হয়। পাইপে যেখানে ছিদ্র আছে সেখানে তেল বা জলের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় বস্তুটি বেড়িয়ে আসে ও গণক যন্ত্রে ধরা পড়ে। ওপরে শিল্পে রেডিও আইসোটোপের ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল এছাড়া আরও নানারকমের প্রয়োগ আছে।

১১ চিকিৎসায় কেন্দ্রীন শক্তি

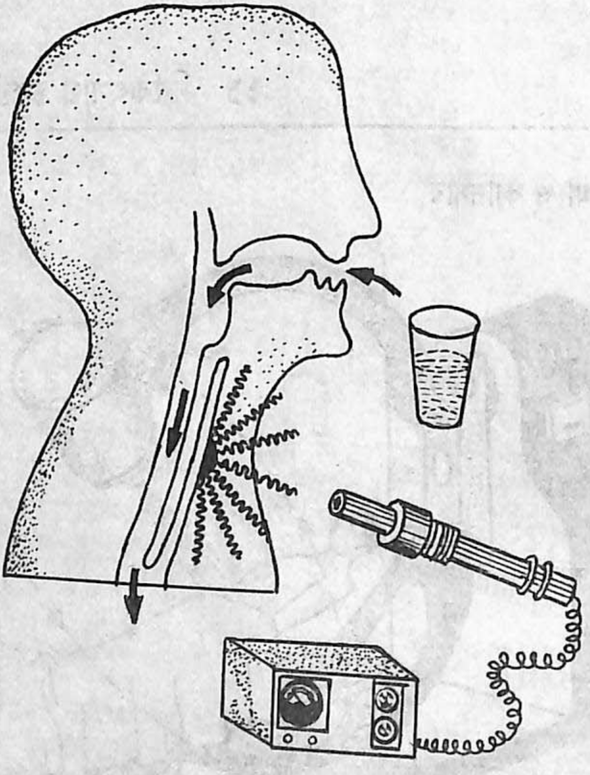
কোবাল্ট বোমা ও ক্যানসার



৩৪ ক্যানসার রোগ ও তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার

বহু রেডিও আইসোটোপের মধ্যে কোবাল্ট-৬০ হলো একটি । ক্যানসার রোগীদের দেহে এর ব্যবহার অপরিহার্য । এই রেডিও আইসোটোপ থেকে উচ্চশক্তি গামা রশ্মি বেড়িয়ে আসে এবং তা দেহের ক্যানসার কোষগুলিকে ধ্বংস করে । সীসার তৈরী খুব ভারী আবরণের মধ্যে এই আইসোটোপটি রাখা হয় ও সুতীব্র গামারশ্মিকে অসুস্থ কোষের মধ্যে ফেলা হয় । এই প্রক্রিয়াটিকে কোবাল্ট বোমা বলা হয় । এই বোমা পরমাণু বোমার মত মানুষের জীবন ধ্বংস না করে জীবনকে বাঁচায় । কোবাল্ট-৬০ এর সুতীব্র গামারশ্মি স্বাস্থ্যবান কোষগুলিকে ধ্বংস না করে কেবল অসুস্থ কোষগুলিকেই নষ্ট করে দেয় ।

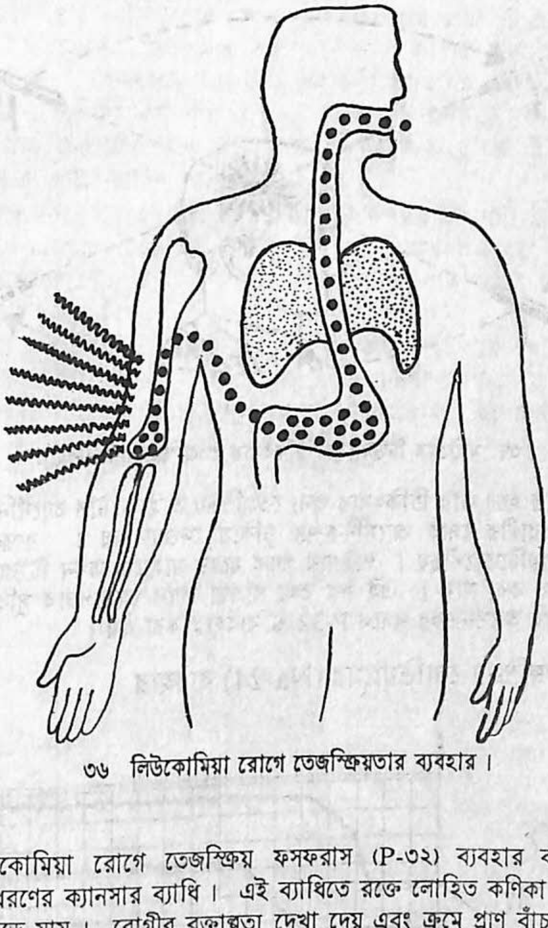
তেজস্ক্রিয় আইওডিন (I-১৩১) ও থাইরয়েডের অসুস্থতা



৩৫ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ক্যানসার ও রেডিও আইসোটোপের ব্যবহার ।

গলার কাছে শ্বাসনালীর পাশের মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থিটি অবস্থিত । এই গ্রন্থির যে কোন অসুস্থতায় তেজস্ক্রিয় আইওডিন ব্যবহৃত হয় । এই গ্রন্থিটির মধ্যে সব সময় কিছু আইওডিন থাকে । এই গ্রন্থিটি ক্যানসার রোগ আক্রান্ত হলে রোগীকে খাবারের সঙ্গে সামান্য তেজস্ক্রিয় আইওডিন খাইয়ে দেওয়া হয় । রক্তস্রোতের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় আইওডিন আক্রান্ত থাইরয়েড গ্রন্থিতে গিয়ে পৌঁছয় । এখানে তেজস্ক্রিয় আইওডিন থেকে বিকিরণ বেরুতে থাকে ও রোগের উপম ঘটে । তেজস্ক্রিয় আইওডিন যে থাইরয়েড গ্রন্থিতে পৌঁছুচ্ছে এবং তার কাজ সুরু করে দিয়েছে তা রোগীর গলার কাছে একটি গাইগার গণক যন্ত্র বসিয়েই বোঝা যায় ।

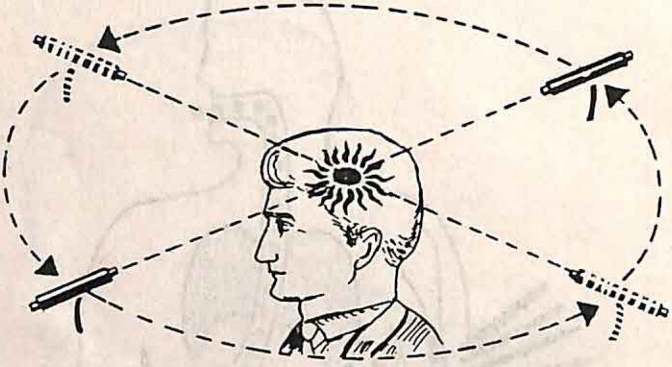
তেজস্ক্রিয় ফসফরাস (P-৩২) ও লিউকোমিয়া



৩৬ লিউকোমিয়া রোগে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার।

বিপজ্জনক লিউকোমিয়া রোগে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস (P-৩২) ব্যবহার করা হয়। লিউকোমিয়া এক ধরণের ক্যানসার ব্যাধি। এই ব্যাধিতে রক্তে লোহিত কণিকা কমে গিয়ে শ্বেতকণিকা খুব বেড়ে যায়। রোগীর রক্তাল্পতা দেখা দেয় এবং ক্রমে প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। এই রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীর হাড়ে (যেখান থেকে ক্যানসার আক্রান্ত শ্বেত কণিকা তৈরী হয়) ফসফরাস-৩২ (P-৩২) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফসফরাস থেকে বিকিরণ বেড়িয়ে এসে এই অসুস্থ কণিকাদের ধ্বংস করে দেয়। হাড়ের অন্যান্য রোগে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।

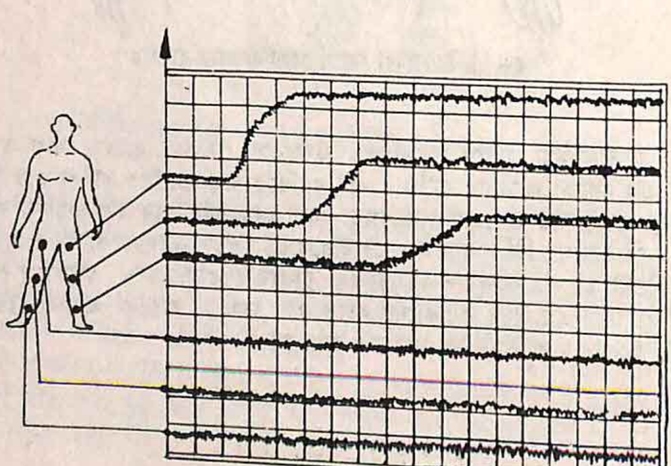
তেজস্ক্রিয় আর্সেনিক (As–98) ও মস্তিস্কে টিউমার



৩৭ মস্তিষ্কের টিউমারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার

মস্তিষ্কে টিউমার হলে তার চিকিৎসার জন্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আর্সেনিক-৭৪ ব্যবহার করা হয়। রোগীর দেহে আর্সেনিক-৭৪ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। রক্তে বাহিত হয়ে আর্সেনিক টিউমারটিতে পৌঁছয়। গাইগার গণক যন্ত্রের সাহায্যে তখন টিউমারটির অবস্থান ও আয়তন নির্ণয় করা যায়। এই সব তথ্য পাওয়া গেলে অস্ত্রোপচার সুবিধাজনক হয়। কোন কোন সময়ে আর্সেনিকের বদলে P-32 ও ব্যবহার করা হয়।

হৃদ্‌রোগে তেজস্ক্রিয় সোডিয়ামের (Na-24) ব্যবহার



৩৮ শরীরের রক্তবাহীনালীর সংকীর্ণতা ধরার কাজে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার

তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম (Na-২৪) কিছু কিছু হৃদ্‌রোগ নির্ণয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। সোডিয়ামকে নাড়াচাড়া করা বেশ অসুবিধাজনক। এই কারণে তেজস্ক্রিয় সোডিয়ামকে লবণে পরিণত করা হয়। এই লবণের দ্রবণকে হাতের শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইনটারভেনাস ইনজেকসন বলে। রক্তে বাহিত হয়ে সোডিয়াম লবণ হৃদ্‌যন্ত্রে গিয়ে পৌঁছয়। হৃদ্‌যন্ত্রের কাছাকাছি একটি গাইগার যন্ত্র রাখলে সোডিয়াম-২৪ থেকে বেড়িয়ে আসা বিকিরণ ধরা যায়। বাহু থেকে রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে পৌঁছতে কত সময় লাগছে তা জানা যাবে এবং তার থেকে বোঝা যাবে হৃদ্‌যন্ত্র কি ভাবে রক্ত পরিবহন করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে বলে রেডিও কার্ডিওগ্রাফি।

শরীরের কোথাও যদি কোন রক্তবাহী নালী সঙ্কীর্ণ থাকে তার তাও Na-28 এর সাহায্যে ধরা যেতে পারে। এখানেও তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম লবণ ইনজেকসন দেওয়া হয়। সেখান থেকে পায়ের বিভিন্ন জায়গায় যেতে কত সময় লাগছে তার থেকে বোঝা যায় দেহে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

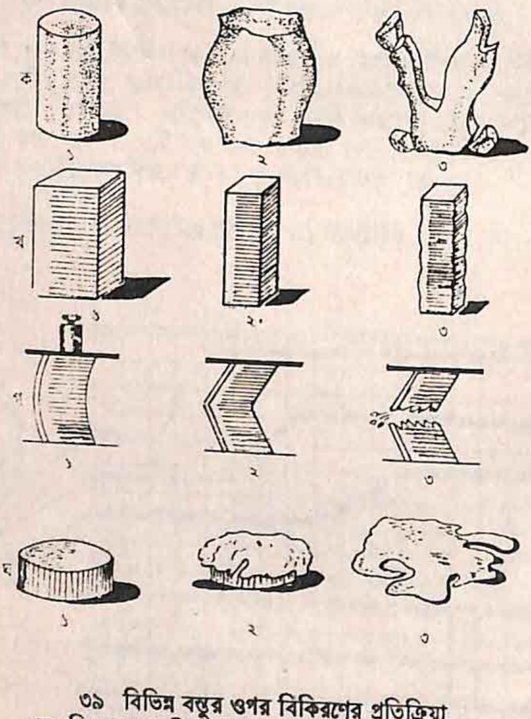
ওপরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রেডিও আইসোটোপের কয়েকটি ব্যবহারের কথা বলা হলো। আরও বহু ধরণের ব্যবহার আছে। সমস্ত বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ব্যাপারে রেডিও আইসোটোপকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছেন।

১২ কেন্দ্রীন বিকিরণের প্রতিক্রিয়া ও তার প্রতিবিধান

বস্তুর ওপরে বিকিরণের প্রতিক্রিয়া

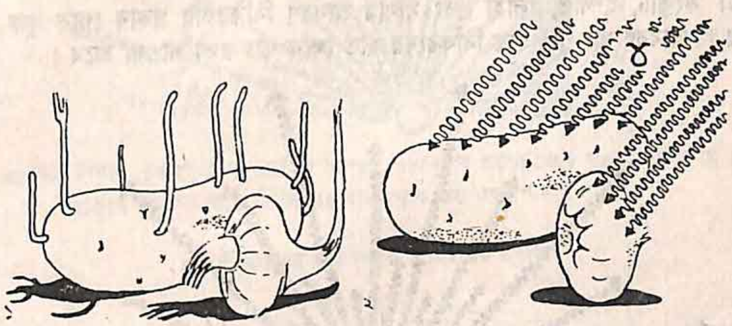
যখন কোন জিনিষের মধ্য দিয়ে সুতীব্র কেন্দ্রীন বিকিরণ ভেদ করে যায় তখন তার মধ্যে ভৌত, রাসায়নিক অথবা দুইধরণের পরিবর্তনই আসতে পারে। প্রাণী, উদ্ভিদ কোষে এবং টিসুতে নানাধরণের পরিবর্তন আসে।

কেন্দ্রীন বিকিরণের প্রভাবে আয়নীভবন ঘটে। এই কারণে কেন্দ্রীন বিকিরণ মৌলিক বস্তুর গঠনের মধ্যে যে পরমাণু বা অণু আছে তাদের স্বাভাবিক বিন্যাসকে নষ্ট করে দেয়। যখন নিউট্রন বা প্রোটন পর্যাপ্ত শক্তি নিয়ে কেলাসের (crystal) মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার কেলাসের মধ্যেকার পরমাণুকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় ফলে বস্তুটির ধর্মই যায় পাল্টে। ছবিতে দেখানো হলো প্লাস্টিকের ওপরে আয়নীভবন সৃষ্টিকারী বিকিরণের কি প্রভাব।



৩৯ বিভিন্ন বস্তুর ওপর বিকিরণের প্রতিক্রিয়া
ক–ফিনল, খ–পলিস্টেরিন, গ–পলিইথিলিন, ঘ–বিউটিলরবার
১-বস্তুগুলির স্বাভাবিক অবস্থা, ২-স্বল্প বিকিরণের ফলে অবস্থার পরিবর্তন,
৩-তীব্র বিকিরণের ফলে অবস্থার পরিবর্তন।

বস্তুর ওপরে বিকিরণের প্রতিক্রিয়া বড় জটিল। এই বিষয় নিয়ে নানা পরীক্ষা ও গবেষণা চলছে। বিকিরণের সাহায্যে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করা চলে। খাদ্যবস্তু কোন আধারে রেখে তার ওপরে বিকিরণ ফেললে খাদ্যবস্তু সংরক্ষিত থাকে, তা তেজস্ক্রিয় হয় না এবং সুগন্ধও নষ্ট হয় না। সামান্য পরিমাণ বিকিরণই খাদ্য সংরক্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট। যে সব সূক্ষ্ম জীবাণু, প্যারাসাইট বা পোকা মাকড় শস্যের ক্ষতি সাধন করে তাদের বিনষ্ট করার কাজে সুতীব্র গামারশ্মি ব্যবহার করা হয়।



৪০ সংরক্ষণে বিকিরণের প্রয়োগ।
(১) বেশীদিন সংরক্ষিত হলে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদিতে গাছ বেড়িয়ে যায়।
(২) স্বল্প বিকিরণের ব্যবহারে এই গুলিকে দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত করা যায়।

মানব দেহে বিকিরণের প্রতিক্রিয়া

বিকিরণের প্রভাবে প্রাণীদের কি ক্ষতি হয় তা নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ বিশেষ চিন্তিত। এর কারণ হলো বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র সম্ভার বেড়েই চলেছে। দেখা গেছে অনেকক্ষণ ধরে বিকিরণের মধ্যে থাকলে মানুষের আয়ু কমে যেতে পারে। বিকিরণের প্রভাবে মানুষের ক্যানসার, লিউকেমিয়া নানারকমের রোগ হতে পারে ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া জীনের গঠন (Genetic Change) পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে এমন রোগ দেখা দেয় যা বংশ পরম্পরায় বাহিত হতে পারে।

বিকিরণ মাপার একটা একক আছে। R (রঞ্জন) হচ্ছে একটি একক যার দ্বারা রঞ্জন রশ্মি বা গামা রশ্মির পরিমাপ করা হয়। যখন এই দুই রশ্মি বাতাসের মধ্য দিয়ে যায় তখন আয়নীভবন ঘটে (ionization)। প্রতি ০·০০১২৯৩ গ্রাম বায়ুতে এক একক তড়িতাধান সৃষ্টি করতে পারে যে পরিমাণ রশ্মি তাকেই বলা হয় এক রঞ্জন বা R। মানব দেহের যখন এই রশ্মি ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বলা হয় Rem যার অর্থ হলো মানব দেহের প্রতিক্রিয়ার একক — Rongent equivalent of man. কত হারে বিকিরণ গেলে কি ক্ষতি হয় তা মোটামুটি ভাবে এই রকম। (১) ৫০ Rem এ কার্যক্ষমতার কোন পরিবর্তন হয় না। (২) (৫০-১০০) Rem-এ রক্তে পরিবর্তন লক্ষিত হয়, অসুস্থতা বোধ আসে। (৩) (২০০-৪০০) Rem হলো বিপজ্জনক মাত্রা। বিকিরণের মাত্রা ৬০০ Rem হলে তার প্রতিক্রিয়া হয় চরম। অবশ্য যে সব পরিমাপের কথা বলা হলো তা যে সব মানুষের বেলাতে একই থাকবে তা নয়, মানুষে মানুষে হেরফের হতে পারে।

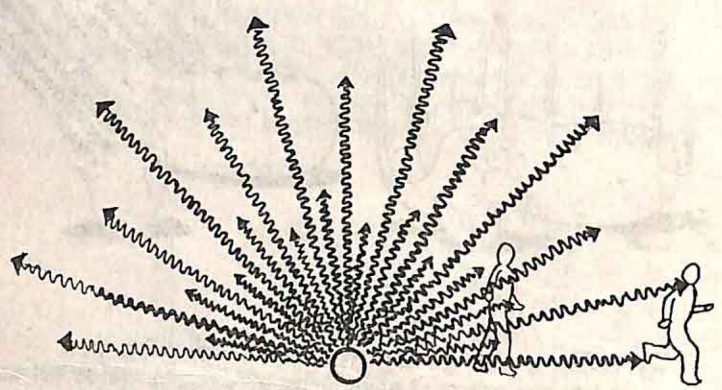
বিকিরণের প্রভাব থেকে নিরাপত্তা

মোটামুটি ভাবে তিন রকম উপায়ে মানুষ বিকিরণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

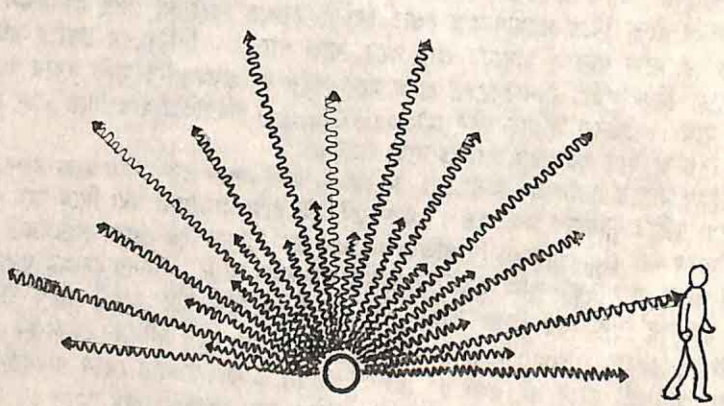
(১) বিকিরণের সংস্পর্শে যত কম সময় থাকা যায় তত বিকিরণের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(২) বিকিরণের উৎস থেকে যত দূরে থাকা যায় তত বিকিরণের প্রভাব কম পড়ে। বিকিরণের তীব্রতা দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক।

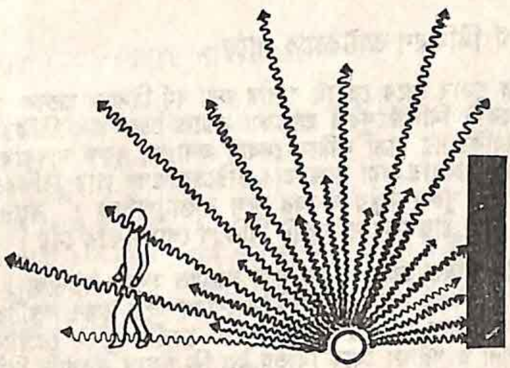
(৩) কংক্রীট, ইস্পাত, লোহা এবং সীসার আবরণ বিকিরণের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে। আবরণ যত পুরু হবে বিকিরণের হাত থেকে তত রক্ষা পাওয়া যাবে।



(১) বিকিরণের সংস্পর্শে যত কম সময় থাকা যায় তত বিকিরণের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।



(২) বিকিরণের উৎস থেকে যত দূরে থাকা যায় তত বিকিরণের প্রভাব কম পড়ে।
বিকিরণের তীব্রতা দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক।



(৩) কংক্রীট, ইস্পাত, লোহা, সীসা প্রভৃতির আবরণ বিকিরণের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে। আবরণ যত পুরু হবে বিকিরণের হাত থেকে তত রক্ষা পাওয়া যাবে।

৪১ বিকিরণের হাত থেকে অব্যাহতির উপায়

আবহাওয়া মণ্ডলে আলফা কণারা খুব বেশী দূর যেতে পারে না। কাগজ বা পাতলা কোন আবরণ দিয়েই তাদের আটকে দেওয়া যায়। নিরাপত্তার দিক থেকে এরা খুব অসুবিধার সৃষ্টি করে না যদিও শরীরের সান্নিধ্যে এলে এরা খুবই ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে। বিটা রশ্মি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এ্যালুমিনিয়াম বা প্লাষ্টিকের বর্ম ব্যবহার করলে চলে। বিটারশ্মি চোখের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। গামারশ্মির হাত থেকে বাঁচতে গেলে এমন বর্ম ব্যবহার করতে হবে যা গামারশ্মি শোষণ করে নেয়। এধরণের বস্তুর মধ্যে আছে লোহা, সীসা ও ষ্টীল। অবশ্য জল, কংক্রীট প্রভৃতি জিনিষও গামা রশ্মি শোষণ করে নিতে পারে।

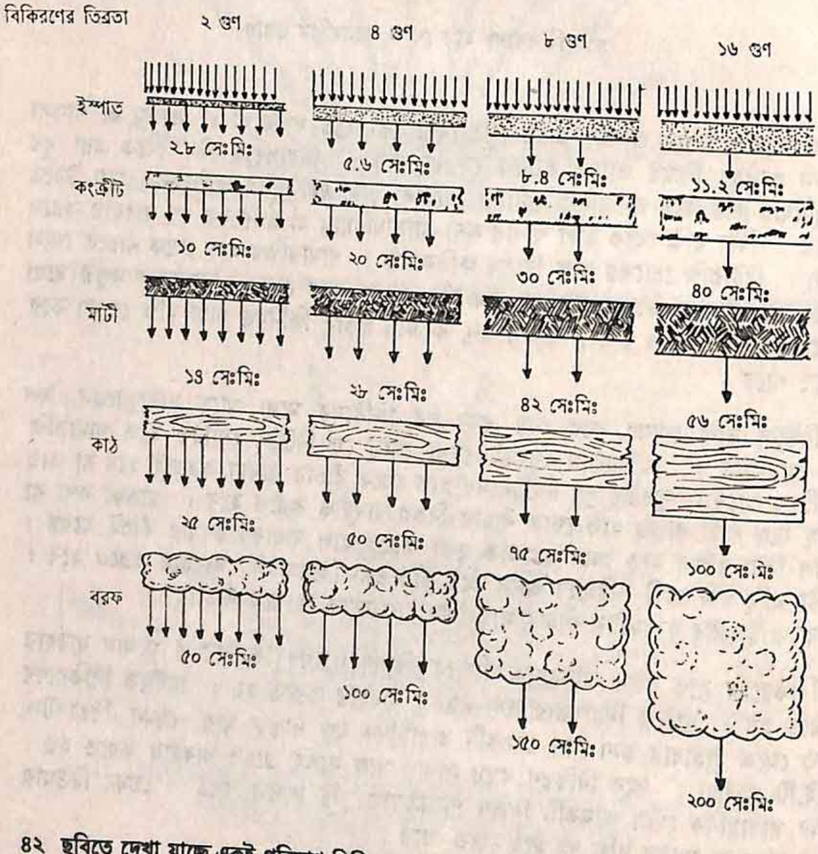
নিউট্রন রশ্মি শোষণ করে নেয় এমন সব জিনিষের মধ্যে আছে হাইড্রোজেন, জল ও প্যারাফিন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে নিউট্রন শোষিত হলে গামারশ্মি বেড়িয়ে আসে। সুতরাং শুধু নিউট্রনদের হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করলেই হবে না তার সঙ্গে সঙ্গে গামা রশ্মির হাত থেকে বাঁচার বিকল্প ব্যবস্থাও করতে হবে। আলফা কণা বা দুর্বল বিটা রশ্মির হাত থেকে চোখকে রক্ষা করতে হলে সাধারণ চশমার কাঁচই যথেষ্ট। বিটা রশ্মি যদি বেশী পরিমাণে আসে তবে তার জন্য বিশেষ কাঁচ ব্যবহার করতে হবে। সীসা ও টাংষ্টেন ফসফেটের কাঁচ গামা রশ্মির হাত থেকে চোখকে বাঁচাবে।

বিকিরণের হাত থেকে শ্বাসযন্ত্রকে বাঁচাতে বিশেষ ধরণের ফিলটার ও মুখোস ব্যবহার করতে হয়। হাতের নিরাপত্তার জন্য দস্তানা ব্যবহার করতে হয়। প্রাণীকে বিকিরণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বেশ কয়েকটি রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায় যেমন (বিকাপটাস এ,ই,টি প্রভৃতি)। তবে বিকিরণ গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই এদের ব্যবহার করতে হয়। এসব রাসায়নিক যৌগ কয়েকটি বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারে – যেমন টিউমার হতে পারে বা দেহের বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কি পরিমাণ পুরু বর্ম বিকিরণ আটকাতে পারে

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব থেকে রেহাই পাবার জন্য বর্ম হিসাবে অনেক বস্তুই ব্যবহার করা যায়। বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পুরুত্ব অতিক্রম করলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে যায়। বিকিরণের মাত্রা কমিয়ে দেবার জন্য যে পুরুত্ব ব্যবহার করতে হবে তা নির্ভর করবে যে বস্তু ব্যবহার করা হচ্ছে তার চরিত্রের ওপর আর বিকিরণের তীব্রতার ওপর। মোটামুটি ভাবে পুরুত্ব বস্তুর ঘনত্বের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক। বস্তুর মধ্যে দিয়ে গেলে বিকিরণের মাত্রা কমে যায় কেন না বস্তুটি বিকিরণ শোষণ করে নেয়।

আলফা কণা সহজেই শোষিত হয়। বিটা কণা শোষিত হওয়া কষ্টসাধ্য। গামা রশ্মি সহজে শোষিত হয় না। যখন কোন বস্তু নিউট্রন শোষণ করে তখন বস্তুটির মধ্যে নতুন অসুস্থিত কেন্দ্রীন তৈরী হয়ে যায়। পরে অবশ্য অসুস্থিত কেন্দ্রীন সুস্থিত কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাত্ত্বিক গণনা ও পরীক্ষা থেকে বিভিন্ন বস্তু কি পুরুত্বে কতখানি বিকিরণ আটকে দেবে তা হিসাব করে পাওয়া যায়।



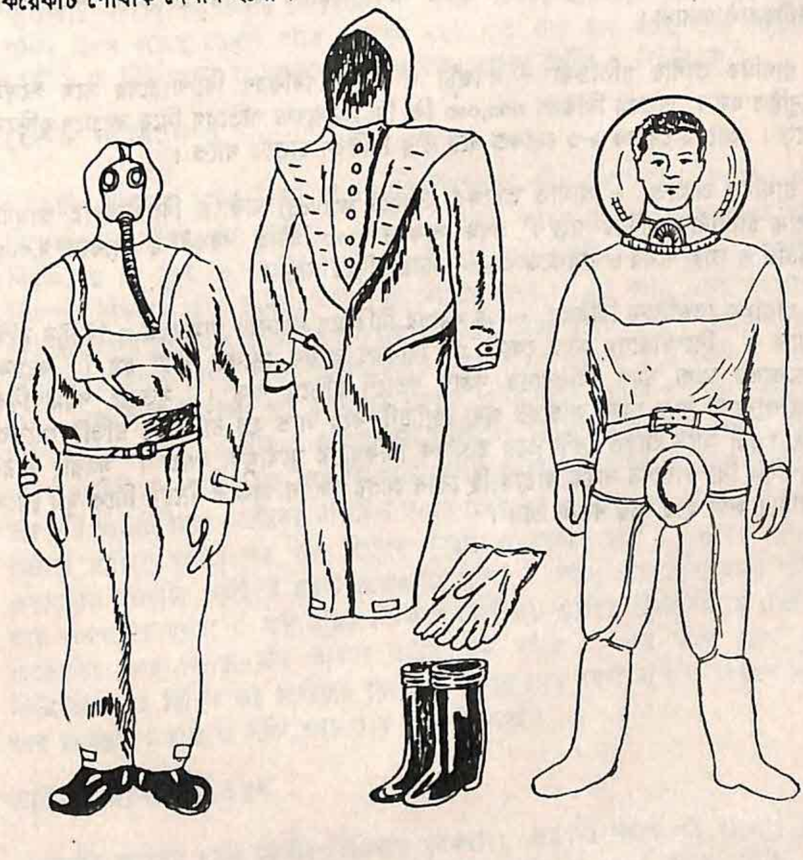
৪২ ছবিতে দেখা যাচ্ছে একই পরিমাণ বিকিরণ রোধ করতে ইস্পাতের পুরুত্ব সবচেয়ে কম লাগে। অর্থাৎ ইস্পাতের প্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী।

বিকিরণের হাত থেকে রেহাই পাবার যন্ত্রাদি

গবেষণাগারে বা পারমাণবিক বিস্ফোরণের সময় বিকিরণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কয়েকটি বিশেষ যন্ত্র বা পোষাকের ব্যবস্থা করা হয়।

১ ফিলটার বা ছাকনি :- এগুলি হলো মুখোস এবং যন্ত্র যা শ্বাসযন্ত্র ও চোখকে বিকিরণের হাত থেকে রক্ষা করে।

২ পরিধেয় পোষাক :- এতে থাকে বিশেষ বস্তু দিয়ে তৈরী দস্তানা, জুতো, মোজা পরিধানের পোষাক ইত্যাদি। এদের মধ্য দিয়ে বিকিরণ যেতে পারে না। ছবিতে কয়েকটি পোষাক দেখান হলো।



৪৩ ১ বিকিরণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সারাদেহ ঢাকা জামাকাপড়।
২ বিকিরণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্লাষ্টিকের তৈরী বিশেষ পোষাক।

পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটলে কি করা উচিত

পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে কি করা উচিত সেটা জেনে রাখা ভাল। কি ধরণের বিস্ফোরণ ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া এবং বিস্ফারণের স্থায়িত্ব জানা থাকলে মানুষ নিজেকে খানিকটা রক্ষা করতে পারে যদি অবশ্য সে বিচলিত না হয়ে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করে।

বিস্ফোরণে তিন ধরণের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে – তাপীয়, আঘাত জনিত ও তেজস্ক্রিয়। আবহাওয়া মণ্ডলে বিস্ফোরণ ঘটলে এ প্রতিক্রিয়া বেশ কয়েক ঘণ্টার মত স্থায়ী হতে পারে। তিনটি প্রতিক্রিয়া একই সঙ্গে সংঘটিত হলেও প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়ার স্থায়ীত্বকাল আলাদা।

প্রাথমিক তাপীয় প্রতিক্রিয়া – বর্ণচ্ছটা ও তাপীয় বিকিরণ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। আগ্নেয় বিকিরণ ৩০০,০০০ কি: মি: / সেকেন্ড গতিবেগ নিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। আগ্নেয় গোলক ২-৩ সেকেন্ড ধরে তীব্র বিকিরণ ছাড়তে থাকে।

প্রাথমিক আঘাত – আঘাত তরঙ্গের (Shock waves) আকারে বিস্ফোরণের জায়গা থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম সেকেন্ডে ১০০০ মিটার, পরবর্তী ৫ সেকেন্ডে ২,০০০ মিটার ও তার পরের ৮ সেকেন্ডে ৩০০০ মিটার ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাথমিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ – এ ধরণের বিকিরণে প্রধানতঃ গামারশ্মি ও নিউট্রন রশ্মি থাকে। বিস্ফোরণের সময় থেকে এই বিকিরণ কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত বিকিরণের পঞ্চাশ শতাংশ ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং পরমাণবিক বিস্ফোরণের সময় কোন আশ্রয়ের জন্য ছোটছুটি করে লাভ হয় না কারণ প্রতিটি সেকেন্ড নষ্ট হওয়া মানে আরও বেশী করে প্রাথমিক বিকিরণের মুখোমুখী হওয়া। সুতরাং পারমাণবিক বিস্ফোরণের সময়ে কাছাকাছি কোন আশ্রয় স্থল না থাকলে নীচের দিকে মুখ রেখে মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়াই ভাল।

১৩ কেন্দ্রীন শক্তির উৎস

ক্ষুদ্রকায় সৌর মণ্ডলী

সৃষ্টির বৈচিত্র্য সত্যিই চমৎকার। বাইরের জগতে আমাদের পরিচিত সৌরমণ্ডলীর মত আরও অনেক বড় বড় সৌরমণ্ডলী আছে। সূর্যের যেমন গ্রহ উপগ্রহ আছে আরও অনেক নক্ষত্রেরও সেই রকম গ্রহ উপগ্রহ আছে। অদৃশ্য পরমাণু জগতও অনেকটা সেই রকম। প্রত্যেকটি পরমাণু এক একটি সৌরমণ্ডলী। সৌর মণ্ডলীর মাঝখানে যেমন সূর্যে অসীম শক্তির উৎস রয়েছে তেমনি ভাবে পরমাণুর সমস্ত শক্তি জমা হয়ে আছে তার মাঝখানে কেন্দ্রীনে বা নিউক্লিয়াসে। সেখানে সংঘবদ্ধ ভাবে রয়েছে প্রোটন ও নিউট্রনেরা।

কেন্দ্রীন পরিবর্তন ও শক্তি নিঃসরণ

কেন্দ্রীন রূপান্তর সূর্যের বিরাট শক্তি, তেজস্ক্রিয়তার শক্তি, পারমাণবিক বোমার এবং রিয়েকটারের শক্তির জন্য দায়ী। কেন্দ্রীন রূপান্তরে ভরের হ্রাস ও তার ফলেই শক্তি নির্গত হয়। সূর্যে যে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ঘটে তা হলো কেন্দ্রীন সংযোজন। সেখানে বিভাজন প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি বেড়িয়ে আসে। এর কারণ হলো সংযোজন প্রক্রিয়াতে হ্রাস প্রাপ্ত ভর, বিভাজন প্রক্রিয়ায় হ্রাস প্রাপ্ত ভরের চেয়ে বেশী। একই কারণে বিভাজন প্রক্রিয়ায় নির্গত শক্তি তেজস্ক্রিয়তার দরুণ নির্গত শক্তির চেয়ে বেশী। যখন $_{৯২}U^{২০৫}$ কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটে তখন সৃষ্ট ক্রিপটন ও বেরিয়াম কেন্দ্রীন ও মুক্ত নিউট্রনের সম্মিলিত ভর $_{৯২}U^{২০৫}$ কেন্দ্রীন ও আঘাতকারী নিউট্রনের মিলিত ভরের চেয়ে কম। যখন দুটি ডিউটেরিয়াম কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরী করে তখন হিলিয়াম কেন্দ্রীনের ভর দুটি ডিউটেরিয়াম কেন্দ্রীনের সম্মিলিত ভরের চেয়ে কম। সংযোজন বা বিভাজন দুটি ক্ষেত্রেই হারিয়ে যাওয়া ভর শক্তি হিসাবে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। ভরের শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়াটা প্রকৃতিতে একটি প্রয়োজনীয় ঘটনা। সমান প্রয়োজনীয় হলো শক্তির ভরে রূপান্তরিত হওয়া। যদি সুস্থিত হিলিয়াম কেন্দ্রীনকে অসুস্থিত ডিউটেরিয়াম কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত করে দেওয়া যায় তাহলে ভরের বৃদ্ধি ঘটবে। এর মানে হলো দুটি ডিউটেরিয়ামের মিলিত ভর হিলিয়াম কেন্দ্রীনের ভরের চেয়ে বেশী হবে। এখানে শক্তি ভরে রূপান্তরিত হচ্ছে বা শক্তি খরচ করে ভর সৃষ্টি হচ্ছে।

আইনস্টাইনের সমীকরণ

ভরশক্তি রূপান্তর সকল কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার মূলকথা। ভরশক্তি সম্বন্ধে এই ধারণার জন্য আমরা ঋণী বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাছে। ১৯০৫ সালে তিনি এই সম্বন্ধে জগতবাসীকে অবহিত করেন ও $E = mc^2$ সমীকরণটি উদ্ভাবন করেন। E হলো শক্তি। m হলো ভর, c হলো আলোর গতিবেগ।

$$E = mc^2$$

1905 EINSTEIN'S MASS—ENERGY EQUATION

বিভাজন, সংযোজন এবং অন্যান্য সকল কেন্দ্রীন বিক্রিয়া আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ দিয়ে নির্ধারিত হয়। যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ বেড়িয়ে আসে সেখানেই শক্তি নির্গত হচ্ছে। সুতরাং আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমতূল্যতা অনুযায়ী রাসায়ণিক বিক্রিয়ার কিছু পরিমাণ ভর নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইনের সমীকরণ অনুযায়ী এই ভরের হ্রাস এত কম হয় যে একে মাপা যায় না। এই সব রাসায়ণিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনদের আদানপ্রদানের দরুণ ইলেকট্রন কিছুটা স্থিতি শক্তি হারায়। রাসায়ণিক বিক্রিয়ায় যে তাপশক্তি নির্গত হয় তাকে এই হারানো স্থিতি শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সৌরশক্তির উৎস

সূর্যে সংযোজন প্রক্রিয়াটি নিরন্তর ও ব্যাপকভাবে হয়ে চলেছে। এর অর্থ হলো আমাদের গ্রহ মণ্ডলীর কেন্দ্র ধীরে ধীরে ভর হারাচ্ছে। হিসাব করলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪,০০০,০০০ মেট্রিক টন। এই পরিমাণ ভর আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণ অনুযায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই শক্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ধরণের ঘটনা ঘটে চলেছে কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে। একই রকম ভাবে লক্ষ লক্ষ তারা সারা বিশ্বে শক্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যে এই সব শক্তি ক্ষুদ্র পরমাণুর ভেতর থেকে আসছে।

পরমাণুতে হারানো ভর

ইলেকট্রনের ওজন এতই কম যে তাকে উপেক্ষা করা চলে। তাহলে কেন্দ্রীনের ওজন প্রোটন ও নিউট্রনদের মিলিত ওজনের সমান হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃত ওজন করে দেখা গেছে যে কেন্দ্রীনের ভর প্রোটন ও নিউট্রনদের সম্মিলিত ভরের চেয়ে কিছু কম। সঠিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে হিলিয়াম পরমাণুর ভর ৪·০০২৮০ ভর একক। হিলিয়াম কেন্দ্রীনে আছে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। প্রোটনের ভর হলো ১·০০৭৫৮ ভর একক ও

নিউট্রনের ভর ১·০০৮৯৬ ভর একক। মিলিত ভাবে নিউট্রনের ও প্রোটনের ভর হলো ৪·৩ ৩০২ ভর একক যা হিলিয়াম পরমাণুর ওজনের চেয়ে (৪·৩ ৩০২ – ৪·০০২৮০) = ·০৩০২২ ভর একক কম। এই অবস্থাটা বেশ চিত্তাকর্ষক। যখন প্রোটন ও নিউট্রনেরা মিলিত হয়ে কেন্দ্রীন তৈরী করে তখন এই পরিমাণ ভর হারায়। মনে হয় যেন কেন্দ্রীনের মধ্যে একত্রে থাকবার অধিকার পাওয়ার জন্য বুঝিবা মূল্য হিসাবে এই পরিমাণ ভর হারাতে হয়। এই হারানো ভর পরমাণু তৈরী হবার সময় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এখন প্রশ্ন এই যে হারানো ভরটা কোথায় যায়। কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রনদের মধ্যে যে বন্ধন শক্তি (Binding energy) আছে সেটা আহরণ করতেই পরমাণুর এই ভরের হ্রাস। সাধারণ হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনে একটি মাত্র প্রোটন থাকে সুতরাং এখানে ভর হারানোর প্রশ্নই আসে না। এর পর থেকেই পারমাণবিক সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারানো ভরের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং মাঝামাঝি ওজনের পরমাণুদের অর্থাৎ লোহা (পা: স: - ২৬), ক্রিপটন (পা: স: - ৩৬), বোরণ (পা: স: - ৫৬) বেলাতে হারানো ভরের পরিমাণ খুব বেশী। বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীনে এদের বন্ধন শক্তি খুব বেশী। এর পরে যত পারমাণবিক সংখ্যা বাড়তে থাকে ততই ভরের হ্রাস হতে থাকে অর্থাৎ কেন্দ্রীনের বন্ধন শক্তি কমতে থাকে। এর মানে হলো এই সব পরমাণুর কেন্দ্রীন ক্রমশঃই অসুস্থিত হয়ে পড়ে। দেখা গেছে $_{৯২}U^{২০৫}$ কেন্দ্রীনে হারানো ভরের পরিমাণ সবচেয়ে কম অর্থাৎ এর কেন্দ্রীন সবচেয়ে অসুস্থিত।

স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীনে বন্ধন শক্তি যার যত বেশী তাকে তত বেশী শক্তি সরবরাহ করতে হবে কেন্দ্রীনকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য। সেই হিসাবে $_{৯২}U^{২০৫}$ কে সবচেয়ে কম শক্তি লাগবে ভাঙ্গবার জন্য। একটি নিউট্রন দিয়ে $_{৯২}U^{২০৫}$ কে আঘাত করা হয় তখন $_{৯২}U^{২০৫}$ দুটি সুস্থিত কেন্দ্রীন Kr ও Ba এ ভেঙ্গে যায়। এরা সুস্থিত কেন্দ্রীন কারণ এদের কেন্দ্রীন গঠনের সময় হারানো ভর ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে হারানো ভরের চেয়ে বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভাজনের সময় বিভাজনকারী কেন্দ্রীনের হারানো ভরের চেয়ে বিভাজনে উৎপন্ন কেন্দ্রীন গুলির হারানো ভরের পরিমাণ বেশী হয়। বিভাজন কারী কেন্দ্রীনের হারানো ভর এবং উৎপন্ন কেন্দ্রীনের হারানো ভরের মধ্যে যে তফাৎ তাই বিভাজন প্রক্রিয়ায় শক্তি হিসাবে নির্গত হয়।

১৪ কেন্দ্রীন শক্তির ভবিষ্যত

১৯৬৪ সালে জেনেভাতে বিভিন্ন দেশের পরমাণু শক্তি কমিশন গুলির একটি বিশ্বসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনে ভারতের ডঃ হোমি ভাবা বলেন ঃ "The clouds of doubts and uncertainity which has obsecured the economies of atomic power here been dispelled and we meet to day in bright sunshine of competitive nuclear power." প্রকৃতপক্ষে এই উক্তির অর্থ দাঁড়ায় যে পৃথিবীর সব দেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রথাগত ব্যবস্থা কিংবা পারমানবিক শক্তি যে কোন একটিকে ব্যবহার করতে পারে।

কেন্দ্রীন শক্তি ও ভারতের সুবিধা

কেন্দ্রীন শক্তি সম্বন্ধে ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে ভারত সর্বতোভাবে সক্ষম। ভারতে প্রচুর কেন্দ্রীন জ্বালানী আছে। এখানকার থোরিয়াম সঞ্চয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এতদিনে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা রিয়েকটার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। তাঁরা এখন বিদেশী সাহায্য ছাড়াই কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্পের নক্সা তৈরী করা ও পরিচালনা করা প্রভৃতি সবকাজই করতে সক্ষম। তারাপোরে প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। রাজস্থান ও কালপক্কামের প্রকল্পগুলিও সম্পূর্ণ। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে কেন্দ্রীন শক্তি থেকে পাওয়া বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০০০ মেগাওয়াট। এই সব সুবিধাগুলির কথা মনে রেখে ভারত দৃঢ়পদক্ষেপে তার লক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

সময়ের প্রশ্ন

কেন্দ্রীন শক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সময়ের প্রশ্নটি খুবই জরুরী। দেরী বা দ্বিধা করলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। কেননা তাতে একটি দেশ অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির চেয়ে পেছিয়ে যেতে পারে। পঁচিশ বছরের ব্যবধানে পৃথিবী পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা, কেন্দ্রীন শক্তি পরিচালিত ডুবো জাহাজ ও কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প তৈরী হতে দেখেছে। ১৯৪৫ সালের আগে এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং কেন্দ্রীন শক্তির ভূমিকাকে একেবারে অবহেলা করা যায় না।

ভারতে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১ মিলিয়ান কিলোওয়াট। ১৯৬৮-৬৯ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪.৫ মিলিয়ান কিলোওয়াট। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীতে ষষ্ঠদশ স্থান অধিকার করে। ১৯৮০ সালের বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়িয়েছে ৫০ থেকে ৬০ মিলিয়ন কিলোওয়াট। এ সত্ত্বেও এই পরিমাণ আমেরিকা বা রাশিয়া যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তার দশ শতাংশ। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবে ভারতকে তার শক্তি উৎপাদনের হার অনেক বাড়াতে হবে যাতে সকল সাধারণ মানুষও এর সুবিধা নিতে পারে।

শক্তি উৎপাদনের প্রচলিত উৎস

ভারতে শক্তির শতকরা ৪২ ভাগ আসে জলবিদ্যুৎ, ৫৪ ভাগ তাপবিদ্যুৎ বাকী শতকরা ৩ ভাগ তেল থেকে। আস্তে আস্তে অবশ্য কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ তার আপন স্থান করে নিচ্ছে।

ভারতে জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা

ভারতে নদনদীর যা অবস্থা তাতে সকল সম্ভবনা খতিয়ে দেখা গিয়েছে যে এদেশে ৪০ মিলিয়ন কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। এই সম্ভাবনাকে পুরোটা কাজে লাগালেও তাপবিদ্যুতের ভূমিকাও ক্রমশঃ বড় হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত এই দুয়ে মিলেও হয়ত বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারবে না। এই সময়ে কেন্দ্রীন শক্তি থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ শক্তি পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হতে পারে।

তাপ বিদ্যুৎ

সারা ভারতে বহু তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে বিশেষতঃ যে সব জায়গায় জলবিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব নয়। দেশের সমস্ত চাহিদার প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ তাপবিদ্যুৎ থেকে পাওয়া যায়। ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ১৩০,০০০ মিলিয়ন টন। অবস্থাটা খুবই সন্তোষজনক। অনেকদিন পর্যন্ত তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার বাড়িয়ে যাওয়া যাবে। বেশীর ভাগ কয়লা খনি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় না এবং নদীর সংখ্যাও কম এসব জায়গায় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলতে কয়লা সরবরাহের খরচা পড়বে অনেক। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও এখানে করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সব জায়গায় কেন্দ্রীন শক্তি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্থান নিতে পারে।

যে সব জায়গায় তাপবিদ্যুৎ পাওয়া সহজ

যে সব জায়গায় তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেখানে পরিপূরক হিসাবে কেন্দ্রীন শক্তির ব্যবহার চলতে পারে। জলবিদ্যুৎ পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবার পর বা কয়লা সঞ্চয় ফুরিয়ে এলে তখন কেন্দ্রীন শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাপ ও জলবিদ্যুৎকে গৌণ করে দিয়ে কেন্দ্রীন শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনই মুখ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কেন্দ্রীন শক্তি প্রতিযোগিতামূলক

আজ এটা সুস্পষ্ট যে উন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীন শক্তি, শক্তি উৎপাদনের অন্যান্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেখানে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেখানে পর্যন্ত কেন্দ্রীন শক্তি আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্রিটেন তাপবিদ্যুতের তুলনায় কেন্দ্রীন শক্তি থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ কম দামে দেওয়া শুরু হয়েছে। ভারতে কেন্দ্রীন শক্তি থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া বিদ্যুতের চেয়ে বেশী দামী। এরকম অবস্থা বেশী কিছু দিন চললেও শেষ পর্যন্ত এহেন পরিস্থিতির পরিবর্তন অবশ্য ঘটবে।

কেন্দ্রীন শক্তি ও শিল্পে ব্যাপকতা

তাপবিদ্যুতের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা কয়েকটি বিশেষ স্থানেই আছে। ফলে কয়লাখনির কাছাকাছি কয়েকটি অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীন শক্তির ব্যবহার যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে শিল্প ক্ষেত্রে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা দূর হবে। কেন্দ্রীন শক্তির সহায়তায় নতুন নতুন শিল্প স্থাপন হওয়ায় স্থানীয় অর্থনীতি উৎসাহ পাবে। কাজের জন্য লোক একজায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় যাবে না কৃষিজীবীদের অবসর সময়ে কাজ পাবার উপায় হবে। কেন্দ্রীন শক্তি দেশে নিরাপত্তার ব্যাপারেও বড় ভূমিকা নেবে।

কয়লা তোলার প্রয়োজন নেই

বাঁধ দেবার প্রয়োজন নেই

কেন্দ্রীন শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে খরস্রোতা নদী বাঁধ দিয়ে বাধার দরকার নেই, দরকার নেই কয়লা তোলার। তবে বেশ কিছু পরিমাণ কেন্দ্রীন জ্বালানী, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। প্রথম দুটিতে ভারত অনেক এগিয়ে। তবে তৃতীয় ব্যাপারে বলা যায় যে ভাবেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হোক না কেন অর্থের প্রশ্ন সব সময় থেকেই যায়।

১৫ ভারতে বিভিন্ন কেন্দ্রীন প্রকল্প

গোড়ার কথা

১৯৮৫ সালে ভারতে পরমাণুশক্তি দপ্তর প্রতিষ্ঠার তিনযুগ অতিবাহিত হলো। এই তিনযুগের ইতিহাস সাফল্যের ও উন্নতির ইতিহাস। ১৯৮৪ সালে এই বিভাগটি ৯০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ বিক্রী করেছে। ১৯৮৫ সালে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। ভাবা এ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারে (BARC), রেডিও আইসোটোপ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দুকোটি টাকা আয় করেছে।

২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যাতে কেন্দ্রীন শক্তির সাহায্যে ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও আয়েজনের কাজ প্রায় সম্পূর্ন। এই পরিমাণ অবশ্য অন্য দেশে যা বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে তার দশ শতাংশ।

ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশন

স্বাধীনতা লাভের প্রায় এক বছর পরে ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। এই সময় থেকে ভারত শান্তিপূর্ন কাজে কিভাবে কেন্দ্রীন শক্তিকে ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে স্বাধীন ভাবে পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীন শক্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনায় ভারতের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমত হলো কেন্দ্রীন শক্তি কাজে লাগিয়ে কম দামে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো রেডিও আইসোটোপ তৈরী করে তাদের শিল্পে, কৃষিতে ও চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা।

পারমাণবিক শক্তি দপ্তর

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চিন্তা ও পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করতে ভারত সরকার পারমাণবিক শক্তি দপ্তর সৃষ্টি করেন। দপ্তরটি সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকে। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এর অর্ন্তগত। এদের মধ্যে আছে ধাতু দপ্তর ও ট্রম্বেতে পারমাণবিক কমিশনের সদর। ভারতের পারমাণবিক কমিশনের প্রানপুরুষ ডঃ হোমি ভাবা বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাঁর নাম অনুসারে গবেষণাকেন্দ্র বা Bhaba Atomic Research Centre বা সংক্ষেপে BARC।

পারমাণবিক ধাতু বিভাগ

পারমাণবিক ধাতু বিভাগটির মূল লক্ষ্য হলো তেজস্ক্রিয় ধাতুর সন্ধান করা ও ধাতুবিজ্ঞানে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা। খনি খনন ও পরিচর্যাও এই বিভাগের দায়িত্ব। অনুসন্ধানের ফলে এই বিভাগটি রাঁচির কাছে মোনাজাইটের বিরাট সঞ্চয় আবিষ্কার করেছে। তামিলনাড়ু ও কেরালার সমুদ্রতটে যে পরিমাণ মোনাজাইট পাওয়া যায় এর পরিমাণ তার চেয়েও বেশী। সমগ্র ভারতে প্রায় ৫০০,০০০ টন থোরিয়াম আছে। সমস্ত পৃথিবীতে এই পরিমাণই সবচেয়ে বেশী। বিহারের আরও কিছু কিছু জায়গায় ইউরেনিয়াম

সঞ্চয় পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্পগুলির প্রয়োজন মেটানোর জন্য জাদুগুদায় ইউরেনিয়াম খনি থেকে প্রায় ১০০০ টন ইউরেনিয়াম তৈরী হয়।

তারাপোরে পারমাণবিক কেন্দ্র, ট্রম্বে

ট্রম্বেতে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র হলো ভারতে কেন্দ্রীন শক্তি সংক্রান্ত গবেষণার প্রাণকেন্দ্র। ১৯৫০ সালে এর প্রতিষ্ঠা। ডঃ হোমি ভাবা এর প্রথম ডিরেক্টার। বহু বিজ্ঞানী, কারিগর, কর্মী এখানে পরমাণুকে শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগানোর জন্য নিরন্তর সাধনায় ব্যস্ত

গবেষণার জন্য রিয়েকটার

ট্রম্বেতে গবেষণার জন্য বেশ কয়েকটি রিয়েকটার চালু আছে। এদের নাম হলো ধ্রুব। পূর্ণিমা অপ্সরা, সিরাস, কামিনী। ধ্রুব রিয়েকটারটি চালু হয়ে গেছে। আশাকরা যায় ১৯৮৬ সালের মধ্যেই এটি সম্পূর্ণ সক্রিয় হয়ে উঠবে।

পূর্ণিমা রিয়েকটার U-২৩৩ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। ১৯৮৪ সালে মে মাসে এটি সম্পূর্ণ ভাবে সক্রিয় হয়। থোরিয়াম চক্র অনুধাবন করায় সক্ষম এধরণের রিয়েকটার পৃথিবীতে এই প্রথম। অপ্সরা হলো প্রথম ভারতীয় রিয়েকটার। এর উৎপাদন ক্ষমতা এক মেগাওয়াট বা ১,০০০,০০০ ওয়াট। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কারিগরেরা মিলে এই রিয়েকটারটির নক্সা বানান ও তৈরী করেন। জ্বালানী হিসাবে এখানে ব্যবহার হয় বর্ধিত শক্তি ইউরেনিয়াম ও মডারেটার হিসাবে ব্যবহার করা হয় ভারী জল। রেডিও আইসোটোপ তৈরীর ব্যাপারে এই রিয়েকটারটি পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য। এই সব রিয়েকটার তৈরী হবার দরুণ রিয়েটারের নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অনেক বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছে। এই কারণে তাঁরা আজ বিদেশী সাহায্য ছাড়াই রিয়েকটার তৈরী করতে সক্ষম।

ইউরেনিয়াম থোরিয়াম প্লান্ট

ট্রম্বেতে গবেষণার জন্য রিয়েকটার ছাড়াও একটি ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম প্লান্ট আছে। এখানে খুব উচ্চমানের বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম তৈরী হয়। ভারতে বর্তমান ও ভবিষ্যত রিয়েকটারের জন্য জ্বালানী ব্যবস্থাও এখানে আছে। ইউরেনিয়াম প্লান্টটি ১৯৬৮ সালে শুরু হয়। শুধুমাত্র গবেষণার জন্য নয় রাণা প্রতাপ সাগর ও কালপক্কামের যে রিয়েকটর তার ইউরেনিয়ামও এখানে তৈরী হয়। থোরিয়াম প্লান্টের একটা উদ্দেশ্য আছে। থোরিয়াম এমনিতে বিভাজন যোগ্য ধাতু নয় কিন্তু প্লুটোনিয়াম রিয়েকটারের মধ্যে রেখে থোরিয়ামকে বিভাজন যোগ্য ইউরেনিয়াম -২৩৩এ পরিণত করে দেওয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী থোরিয়াম পাওয়া যায়। সুতরাং বলা চলে যে পারমাণবিক পরিকল্পনাতে থোরিয়াম অচিরেই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে।

প্লুটোনিয়াম প্লান্ট

ভারতে কেন্দ্রীন শক্তি বিকাশে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে ১৯৬৪ সালে। ঐ বছর জানুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রথম প্লুটোনিয়াম প্লান্টের উদ্বোধন

করেন। এই প্লান্টের উদ্দেশ্য হলো ভারতে যে রিয়েকটার আছে বা হবে সেখানে বিকিরিত জ্বালানী দন্ড থেকে প্লুটোনিয়াম উদ্ধার করা। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম যে সব রিয়েকটারে ব্যবহার করা হয় সেখানে সহযোগী বস্তু হিসাবে প্লুটোনিয়াম তৈরী হয়। খুব জটিল উত্তপ্ত রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লুটোনিয়াম প্লান্ট জ্বালানীর পরিত্যক্ত অংশ থেকে প্লুটোনিয়াম আলাদা করবে। পৃথিবীতে কয়েকটি মাত্র দেশেই প্লুটোনিয়াম প্লান্ট আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো যে প্লুটোনিয়াম নিজে বিভাজনযোগ্য এবং তা ছাড়াও এ থোরিয়ামকে বিভাজনযোগ্য U-২৩৩ এ পরিণত করতে পারবে। এতে ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর কেন্দ্রীন জ্বালানী পাওয়া যাবে।

ট্রম্বেতে প্লুটোনিয়াম প্লান্টটি ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কারিগরেরা মিলে নিরন্তর সাধনার ফলে তৈরী করেছিলেন। কোনরকম বিদেশী সহায়তা কাজে লাগানো হয়নি। কেবলমাত্র পনেরো থেকে পঁচিশ শতাংশ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বাইরে থেকে আমদানী করা হয়েছিল।

ট্রম্বেতে রেডিও আইসোটোপ

ট্রম্বেতে রেডিও কেমিষ্ট্রি ও আইসোটোপ গবেষণার রেডিও আইসোটোপ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী করে। এই সব জিনিষ নিজের দেশে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া বিদেশেও পাঠান হয়ে থাকে। প্রায় ৩৫০টি বিভিন্ন আইসোটোপ ভারতে কৃষি, শিল্প, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। আফগানিস্তান, বার্মা, আর্জেন্টিনা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি জায়গায় আইসোটোপ পাঠানো হয়ে থাকে। ভারতে সমস্ত বড় বড় হাসপাতালে ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য রেডিও আইসোটোপ কোবাল্ট-৬০, থাইরয়েড গ্রন্থির জান্য তেজস্ক্রিয় আইওডিন I-১৩১, লিউকোমিয়া ও মস্তিষ্কের টিউমারের জন্য ফসফরাস-৩২, ও হৃদরোগের জন্য সোডিয়াম-২৪ ব্যবহার করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার শুরু হয়েছে। বাঙ্গালোর ও পুণার মধ্যে যে ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইন আছে তাতে একটি ছিদ্র হয়। এই ছিদ্রটি সনাক্ত করা হয় ব্রোমিন-৮২ এর সাহায্যে। বন্দরে মাটি জমা হয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে। মাটি সরাবার ব্যাপারে রেডিও আইসোটোপের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু মাটি সরিয়ে কোথায় ফেলা হবে সেটাই সবচেয়ে সমস্যা। বম্বে, কোলকাতা ও কোচিন বন্দরে এই অসুবিধা দুর করা সম্ভব হয়েছে। তেজস্ক্রিয় বালি ছড়িয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মাটী ফেলার স্থান সুবিধাজনক স্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পে আইসোটোপের আরও বহু ধরণের প্রয়োগ সম্ভব। লেসার রশ্মির ব্যাপারে নাইট্রোজেন-১৫ সমন্বিত নাইট্রিক এ্যাসিড তৈরীর ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার আজ বহুল প্রচলিত।

ভারতে প্রায় ৩০০ টির মতন প্রতিষ্ঠান ট্রম্বেতে তৈরী আইসোটোপের সাহায্য নিচ্ছে। ট্রম্বেতে বিজ্ঞানীরা কিভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করতে হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে থাকেন। পরমাণু গবেষণার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম আজ সবটাই প্রায় ভারতে তৈরী হচ্ছে। এর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় ইলেকট্রনিক করপোরেশান। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও ভারতীয় ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্র ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের সংগে সংযুক্ত।

ভারতে কেন্দ্রীন শক্তি উৎপাদন প্রকল্প

(ক) তারাপোর শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র

তারাপোর শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র দুটি ফুটন্ত জল রিয়েকটার। তাদের নির্মাণের পনের বছর অতিক্রম করল ১৯৮৪ সালে। প্রথম ইউনিটটি ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এক লক্ষ ঘণ্টা চলেছে। তারাপোরে শক্তি উৎপাদন ষ্টেশন ১৯৮৪ পর্যন্ত ২৮,৩৪০ মিলিয়ন একক বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। এই রিয়েকটার গুলিতে বর্ধিত শক্তি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। নানা ধরণের সংস্কার সাধন করে এমন অবস্থায় আসা গেছে যাতে বিদেশের সাহায্যের ওপর নির্ভর না করতে হয়।

(খ) রাজস্থান পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র

এখানেও তারাপোরের মতন দুটি ইউনিট আছে। প্রথম ইউনিটটি তিনবছর বন্ধ থাকার পর ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার চালু হয়েছে। বর্তমানে এর দুটি ইউনিটই চালু আছে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো রাণা প্রতাপ সাগর পারমাণবিক কেন্দ্র। এখান থেকে দিল্লী, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিদ্যুৎ পায়। এই প্রকল্পটি ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কারিগরদের হাতে তৈরী তবে এর নকশাটি এসেছে কানাডা থেকে। এই রিয়েকটারে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ও ভারী জল ব্যবহার করা হয়। এই দুটিই ভারতে পাওয়া যায়। ভারী জল একযোগে মডারেটার ও শীতলকারী বস্তু হিসাবে কাজ করবে। উচ্চ চাপে জল বাইরের শীতলকারী বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

(গ) মাদ্রাজ পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র

মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ুর মহাবল্লীপুরম শহরের কাছে কালপক্কম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত। এখানে দুটি রিয়েকটার আছে এবং এদের প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ২০০ মেগাওয়াট। রাজস্থান প্রকল্পের মতন এখানেও প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম জ্বালানী হিসাবে ও ভারী জল মডারেটার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই প্রকল্পের প্রথম ইউনিটটি চালু হয়েছে ১৯৮৪ সালে ও অপরটি চালু হয়েছে ১৯৮৫ সালে।

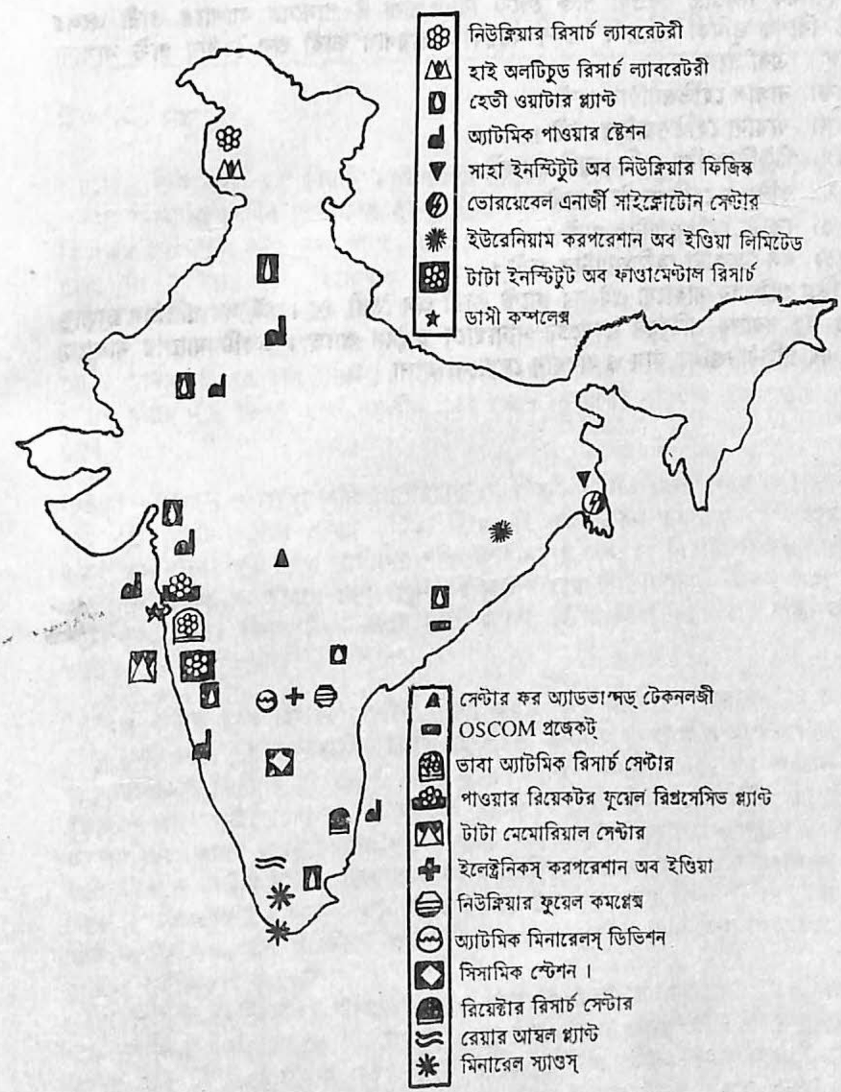
(ঘ) নারোরা পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র

এই প্রকল্পটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এরও দুটি ইউনিট থাকবে। সম্ভবতঃ ১৯৮৯ সাল নাগাদ প্রকল্পটি শেষ হয়ে যাবে। এর বেশ কিছু অংশ ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে।

(ঙ) কক্করাপার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র –

এই প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে ১৯৮৪ সালে। এর দুটি ইউনিট থাকবে এবং নির্মাণ কার্য শেষ হবে ১৯৯১ সালে।

ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্বত্র আরও রিয়েকটার তৈরী হবে ও তার থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। পারমাণবিক কমিশন পনেরো বছরের একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা তৈরী করেছেন।



৪৪ ভারতের পারমাণবিক শক্তির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

ভারতে ভারী জল প্রকল্প

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কেন্দ্রীন শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে ভারী জলের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় ভারী জল তৈরীর প্লান্ট বাসনো হয়েছে। এরা হলো ঃ–

(ক) নাঙ্গাল হেভিওয়াটার প্লান্ট।
(খ) বরোদা হেভিওয়াটার প্লান্ট।
(গ) টিউটিকোরিণ হেভি ওয়াটার প্লান্ট।
(ঘ) তলিচের হেভিওয়াটার প্লান্ট।
(ঙ) কোটা হেভিওয়াটার প্লান্ট।
(চ) থল বৈকোটা হেভিওয়াটার প্লান্ট।

ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই সব প্লান্টে ভারী জল তৈরী হয়। এই সব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও বহু ধরণের প্রতিষ্ঠান ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। একটি ম্যাপের সাহায্যে নীচে এই প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও অবস্থান দেখানো হলো।

১৬ কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প গ্রহণীয় না বর্জনীয়

বিতর্কিত প্রযুক্তি

কেন্দ্রীন শক্তি আজ এক বিরাট মতদ্বৈধতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে। এমন দিন হয়ত পাওয়া যাবে না যেদিন সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে শক্তির এই নূতনতম উৎসটিকে নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করা হচ্ছে না। এ নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছে যেমন – কেন্দ্রীন প্রকল্প কি দুর্ঘটনা বা হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের হাত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত ? প্লুটোনিয়ামের মত বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় ব্যর্জ পদার্থ সৃষ্টি করে কেন্দ্রীন প্রকল্প গুলি কি মানুষের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলবে ? বিভিন্ন দেশের মধ্যে কেন্দ্রীন শক্তি সংক্রান্ত প্রযুক্তি আদানপ্রদানের ফলে পৃথিবীতে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের সংখ্যা কি বাড়তে থাকবে ? বিরাট খরচে গড়ে তোলা একটি কেন্দ্রীন প্রকল্প থেকে কি যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুতশক্তি পাওয়া যাবে ?

অদূর ভবিষ্যতে আমাদের শক্তির চাহিদার যে বিরাট ঘাটতি দেখা দেবে সেই ভাবনার প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীন শক্তির আসন্ন ভূমিকা নিয়ে এই সব তর্কের অবতারণা। আমাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা ও আমাদের শক্তি উৎপাদনের মধ্যে যে বিরাট ফারাক আছে তা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বেশ অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে শক্তি সংরক্ষণ ও শক্তির বিকল্প উৎস সন্ধান করে আমরা এই অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করতে পারি।

বিকল্প শক্তির উৎস হিসাবে কেন্দ্রীন শক্তির কথাই মনে আসে। প্রয়োজন যে মেটাতে পারে এমন একটি পদ্ধতি সামাজিক ভাবে গ্রহণীয় না বর্জনীয় ? ভাল ও মন্দের বিচার না করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই পদ্ধতি কাজে লাগানো যাবে কিনা – এই সব প্রশ্নগুলি নিয়ে খুব ভাল ভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। যতই কেন্দ্রীন শক্তিকে দেশ গভীর ভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে ততই কেন্দ্রীন শক্তির নানান ভালমন্দ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। শক্তির উৎস হিসাবে কেন্দ্রীন শক্তির ব্যবহারকে চুলচেরা বিচার করতে হবে তার প্রযুক্তিগত দিক থেকে। বিচারের সর্ত হবে – (১) প্রযুক্তির জন্য উপকরণ পর্যাপ্ত কিনা ? (২) মানুষ ও আবহাওয়ার ওপর এর প্রতিক্রিয়া কতখানি পড়বে ? (৩) অর্থনৈতিক দিক থেকে এই প্রযুক্তির যৌক্তিকতা কতখানি ?

কেন্দ্রীন শক্তি প্রযুক্তি যতই পরিণতির দিকে এগিয়েছে ততই মানবসমাজে তার ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে তর্ক বেড়েছে। আমরা পরের কয়েকটি পাতায় কেন্দ্রীন শক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব যাতে পাঠক ভবিষ্যত শক্তির উৎস হিসাবে কেন্দ্রীন শক্তির ভূমিকাকে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে বিচার করতে পারেন। লেখকের তরফে একটি বক্তব্য অবশ্যই আছে। যে কোন বিতর্কিত বিষয়ের সব দিক থেকে বিচার করা দরকার। বিচারের মধ্যে কিন্তু বিজ্ঞান জিজ্ঞাসু হিসাবে লেখকের নিজস্ব একটি মতামত আভাসিত হতে পারে কিন্তু চরম বিচারের ভার সাধারণ মানুষের আর যাঁদের হাতে দেশ পরিচালনার ভার। মনে হয় কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক দিকে গুলি খুব ভাল ভাবে তুলে ধরা হয়নি। ফলে কেন্দ্রীন শক্তি সংক্রান্ত সব আলোচনাতে কিছু ভুল ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

কেন্দ্রীন শক্তি – স্থায়ী প্রযুক্তি হতে পারে কিনা ?

কোন প্রযুক্তিকে সামাজিক ভাবে স্থায়িত্ব পেতে ও ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হতে গেলে তাদেরকে উপরিউক্ত তিনটি শর্ত মানতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্পে আমরা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করি থোরিয়াম আর ইউরেনিয়াম। কোন জায়গায় কেন্দ্রীন প্রকল্প গড়ে উঠতে পারে কিনা তা মূলতঃ নির্ভর করবে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়ামের যোগানের ওপর। ভারতে ইউরেনিয়ামের সঞ্চয় বেশ ভাল। এদিক থেকে ভারতে কেন্দ্রীন প্রকল্প গড়ে তোলার নীতিগত ভাবে কোন অসুবিধা নেই। কিছু কিছু রিয়েক্টারে থোরিয়াম ব্যবহার করা হয়। ভারতে থোরিয়ামের ও অভাব নেই।

কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প ও নিরাপত্তার প্রশ্ন

কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প কতখানি নিরাপদ ? এই প্রযুক্তি সমাজের পক্ষে কতখানি বিপদ ডেকে আনতে পারে ? কেন্দ্রীন প্রকল্পগুলির নিরাপত্তা এখন সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষতঃ ১৯৭৯ সালে আমেরিকার মাইল দ্বীপে ও ১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চারনোবিল রিয়েকটার দুর্ঘটনার পর পৃথিবীর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অনেক সময় যান্ত্রিক গণ্ডগোল, চালনা পদ্ধতির ত্রুটি বা অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য রিয়েকটারে দুর্ঘটনা ঘটে। কেন্দ্রীন রিয়েকটার কিন্তু পরমাণু বোমার মত ফাটতে পারে না। কারণ দুটি জিনিষের মধ্যে সক্রিয় নীতিগুলিই একেবারে ভিন্ন। পরমাণু বোমা তৈরী করার জন্য দরকার U-২৩৫ বা প্লুটোনিয়ামের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর। কিন্তু রিয়েকটারে বিভাজনযোগ্য বস্তুগুলির ঘনত্ব খুবই কম। শুধু তাই নয় রিয়েকটারে এমন ব্যবস্থা করা থাকে যাতে শক্তি উৎপাদন বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেলে রিয়েকটার নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

রিয়েকটার চালু থাকাকালীন প্রভূত পরিমাণে যে সব তেজস্ক্রিয় বস্তু তৈরী হয় তারাই প্রকৃত চিন্তার কারণ। নানাভাবেই এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব তেজস্ক্রিয় বস্তু রিয়েকটারের মধ্যে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাৎক্ষণিক কোন বিপদের সম্ভবনা নেই। কিন্তু যদি কোন কারণে এইসব তেজস্ক্রিয় বস্তুরা জনাকীর্ণ অঞ্চলের আবহাওয়া মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে বিপদের সম্ভবনা দেখা দেয়। রিয়েকটারের পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয় যাতে চরমতম অবস্থাতেও তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি যেন বাইরে বেড়িয়ে আসতে পারে না। এইজন্য রিয়েকটারের মধ্যে কয়েকটি বাধার প্রাচীর তৈরী করা হয়।

এছাড়া আরও নানারকমের সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। শীতলকারী বস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয় যথা ভূমিকম্প বন্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধেও আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। কেন্দ্রীন প্রকল্পের সাবধানতা ব্যাপারটিকে “Defence in depth” বলা হয়। এর অর্থ হলো সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এর ওপরে ধরে নিতে হবে যন্ত্রাংশগুলি কোন সময়ে স্বাভাবিক ভাবে কাজ নাও করতে পারে। তেমন অবস্থার সৃষ্টি হলে কি করা হবে তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

কেন্দ্রীন প্রকল্পের নিরাপত্তা বিষয়টি সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রযুক্তিবিদেরা দুটি প্রধান দুর্ঘটনার কথা মনে রাখেন। (১) রিয়েকটারে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী হয় তারা ছোট ছোট সিরামিক ফুয়েল পেলেটের মধ্যে থাকে। রিয়েকটারে শীতলকারী বস্তু কমে গেলে গরমে এই পেলেটটি গলে গিয়ে তার মধ্যেকার তেজস্ক্রিয় বস্তু বাইরে ছড়িয়ে পড়ে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। একেই বলা হয় 'Core meltdown' (২) আরেক ধরণের সম্ভাব্য দুর্ঘটনার নাম হল 'loss of coolant accident (LOCA)'. ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা ঠিক না থাকলে রিয়েকটারের মূল অংশটি তিরিশ মিনিটের মধ্যে গলে যাবে এবং কয়েকঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়া মণ্ডলে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়বে। এই কারণে প্রাথমিক ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থার সাথে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা হয়। একেই বলা হয় "emergency core colling system"। যদিও কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে তবুও বলা যেতে পারে রিয়েকটারে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা অন্যান্য যে কোন দুর্ঘটনার চেয়ে কম।

তবে কেন্দ্রীন প্রকল্পগুলি থেকে সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় বস্তু বেড়িয়ে আসে। এছাড়া বড় বড় কেন্দ্রীন প্রকল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে তাপ আবহাওয়া মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাপ ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা কেবল যে কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প গুলিতে ঘটে তা নয়। অন্য কোন জ্বালানী ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করলেও প্রচুর পরিমাণে তাপ নির্গত হয়। তবে কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প থেকে নির্গত তাপের মাত্রা নিশ্চিত ভাবে অন্যগুলি থেকে বেশী। কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প থেকে বেড়িয়ে আসা তাপ স্থানীয় জলবায়ুর ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

জীবাশ্মঘটিত জ্বালানীর সাহায্যে যে সব শক্তি প্রকল্প চালানো হয় সেখানে দহনের পর নানাধরণের গ্যাস ও কঠিন পদার্থ ব্যর্জ বস্তু হিসাবে বেড়িয়ে আসে। একটি ১,০০০ মেগাওয়াট শক্তি প্রকল্পে কয়লা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করলে প্রতিবছরে ২৪,০০০ টন সালফার-ডাই-অক্সাইড বেড়িয়ে আসে। জলকণার সংস্পর্শে এসে সালফার-ডাই-অক্সাইড সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে যায় যা পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। এছাড়া কিছু পরিমাণে নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয় যা শ্বাসযন্ত্রের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। এছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড হলো আরেক দূষণকারী বস্তু। কয়লা পোড়ালে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরী হয় তা সমস্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একে বলা হয় "Green house effect" এ ছাড়া ক্ষতিকারক আর্সেনিক, সীসা, পারদ ও সামান্য তেজস্ক্রিয় রেডনও বেড়িয়ে আসে।

যদিও কেন্দ্রীন প্রকল্প থেকে ব্যর্জ বস্তু সরাসরি আবহাওয়া মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে না কিন্তু ব্যর্জ বস্তু হিসাবে সেখানে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তু বেড়িয়ে আসে। এই ব্যাপারটাকে একেবারে পরিহার করা যায় না। তবে একটি কেন্দ্রীন প্রকল্পকে এমন ভাবে তৈরী করা যায় যাতে বেড়িয়ে আসা তেজস্ক্রিয়তা বিপদসীমার অনেক নীচে থাকে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৮৯৫ সালে রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আয়নীভবন সৃষ্টিকারী রশ্মির সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছে। এরপরেই আবিষ্কৃত হয়েছে তেজস্ক্রিয়তা। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রঞ্জন রশ্মির আশাতীত সাফল্য তার ক্ষতিকারক দিকগুলিকে মানুষের নজরে পড়তে দিচ্ছিল না। পরে দেখা গেল দীর্ঘদিন ধরে রঞ্জনরশ্মির সংস্পর্শে থাকলে শরীরের বিপুল ক্ষতি হতে পারে। মানব জীবনের উন্মেষ থেকেই নানধরণের বিকিরণ তার পরিবেশের মাধ্যই রয়েছে। তাছাড়া মহাজাগতিক রশ্মির মধ্য দিয়ে নানান ধরণের বিকিরণ মানুষের দেহে এসে পড়ে। এমন কি মানুষের শরীরের

মধ্যেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে যাদের থেকে বিকিরণ বেড়িয়ে আসে। এই সব আভ্যন্তরীণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে আছে পটাশিয়াম-৪০। পটাশিয়াম-৪০ এর অর্ধজীবন (halflife) হচ্ছে প্রায় এক বিলিয়ন বছর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীন প্রকল্প থেকে বেড়িয়ে আসা বিকিরণই মানুষের জীবনে বিকিরণের একমাত্র উৎস নয়। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে মানুষ একটি বিকিরণ আকীর্ণ পরিবেশে বাস করে। যদি নৈসর্গিক কোন কারণে প্রকৃতি আরোপিত বিকিরণ অস্বাভাবিক বেড়ে যায় তাহলেও বিপর্যয় ঘটতে পারে।

কেন্দ্রীন প্রকল্প স্থাপনের যে অর্থনৈতিক দিকটা আছে তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। একটি কেন্দ্রীন প্রকল্প গড়ে তুলতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্পের যাঁরা প্রবক্তা তাদের মতে কেন্দ্রীন প্রকল্পের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত কমদামে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। যারা কেন্দ্রীন শক্তি ব্যবহারে অনিচ্ছুক তাঁদের হিসাব অনুযায়ী বিদ্যুৎশক্তি স্বল্পমূল্যে হবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মজার ব্যাপার হলো কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্পের অর্থনৈতিক দিক নিয়ে যখনই আলোচনা হয় তখনই আলোচনা-কারীদের ব্যক্তিগত অভিমত একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে নেয় ফলে তর্কজালে প্রকৃত ছবিটা কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে যায়।

কেন্দ্রীন শক্তির ভবিষ্যত

তাহলে কেন্দ্রীন শক্তির ভবিষ্যত কি ? সমাজে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে এর কি ভূমিকা নেওয়া উচিত ? প্রথাগত জ্বালানী যাতে নিঃশেষ না হয়ে যায় সেইজন্য কেন্দ্রীন শক্তি প্রকল্প কি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে ? প্রথাগত জ্বালানী যে হারে শেষ হয়ে আসছে তাতে হয়ত কেন্দ্রীন শক্তিকেই একদিন শক্তির মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে অন্যকোন বিকল্পের স্থায়ী উৎস নজরে আসছে না। কেবল মাত্র পুরানো জ্বালানী আরও ভালভাবে সংরক্ষণ করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সৌরশক্তি বা কেন্দ্রীন সংযোজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যবসায়িক হারে শক্তি পাওয়ার সম্ভবনাও অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে না। অনেক কারণেই কেন্দ্রীণ শক্তি প্রকল্পও অবশ্য সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তবে প্রযুক্তিকে সর্বোচ্চ মানে উন্নীত করে কেন্দ্রীন শক্তিকে গ্রহণ করার পেছনে কোন নীতিগত বাধা নেই। সব কিছুতেই দুর্ঘটনা ঘটার একটা সম্ভাব্যতা থাকে অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে না ঘটতে নাও পারে। সুতরাং দুর্ঘটনা ঘটলে ফলাফল অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে কেবলমাত্র এই আশঙ্কায় একটা প্রযুক্তিকে বাদ দিতে হবে এটা বোধ হয় খুব বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়।

সম্পূর্ণ ভাবে ক্রটি মুক্ত করে কেন্দ্রীন শক্তি কাজে লাগালেও কিন্তু তা অফুরান শক্তির উৎস হতে পারবে না। অন্য কোন ব্যবস্থা না করলে আমাদের ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম সঞ্চয় একদিন শেষ হয়ে যাবে। কেন্দ্রীন বিভাজন থেকে শক্তি পাওয়া তখন সম্ভব হবে না। সেইজন্য আমাদের আরও উচ্চমানের ব্রীডার রিয়েকটার বা তাপকেন্দ্রীন প্রক্রিয়ার (thermo nu-clear fusion) দিকে নজর দিতে হবে। তখন কেন্দ্রীন শক্তি সৌর শক্তির মত শক্তির অফুরান উৎস হয়ে দাঁড়াবে। সব বিচার করে সর্বান্তঃকরণে মানুষ কেন্দ্রীন প্রকল্প গ্রহণ করবে কিনা সে বিচারের ভার আগামী দিনের মানুষের হাতে।

শান্তিপূর্ণ কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ

"India has welcomed and acceded to the partial nuclear test ban treaty as a step towards disarmment. There was, however, no reason why the benefits of causing explosion in civil engineering works should be denied to mankind so long as such explosions were subject to international supervision."

"পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভারত পরমাণু বিস্ফোরণ আংশিক ভাবে বন্ধ করার চুক্তিকে স্বাগত জানায়। কিন্তু বিশ্বের সবজাতির সম্মিলিত তত্ত্বাবধানে নানাবিধ নির্মাণ কার্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীন বিস্ফোরণের সুবিধাগুলির ব্যবহার থেকে মানবজাতিকে বঞ্চিত করার কোন কারণ আছে বলে ভারত মনে করে না।"

ভারতে কেন্দ্রীন যুগের অন্যতম প্রবর্তক হোমি ভাবার উক্তিটির মধ্যে কেন্দ্রীন বিস্ফোরণের একটি ভাল দিক তুলে ধরা হয়েছে। শিল্পে ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতের মত উন্নতশীল দেশে কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ বিরাট এক ভূমিকা নিতে পারে। পৃথিবীতে শক্তির চাহিদা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে আর প্রচলিত শক্তির উৎসগুলিও ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল দুর্ভেদ্য পর্বতের ঘেরাটোপ আটকা পড়ে আছে। শান্তিপূর্ণ কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ এইসব আটকে পড়া গ্যাস বা তেল মানুষের কাছে পৌছে দিতে সাহায্য করতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে আর অন্য কোন উপায়ে এই আবদ্ধ তেল বা গ্যাস বার করা অনেক অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল। খনিবিদ্যাতেও কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নমানের আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতে প্রথমে এইসব আকরকে একেবারে ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলতে হয়। এই ভেঙ্গে গুড়ো করার কাজ অতি সহজেই কেন্দ্রীন বিস্ফোরণের সাহায্যে হতে পারে। ভারতে প্রচুর পরিমাণ আকরিক তামা পাওয়া যায় যাতে মাত্র ১৫% মত তামা আছে। এই সব আকরিক তামা থেকে ধাতু নিষ্কাশনের ব্যাপারে ভারত কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ ব্যবহারে বিশেষ আগ্রহী। এছাড়া কেন্দ্রীন বিস্ফোরণের সাহায্যে খাল খনন বাঁধ তৈরী, কৃত্রিম জলাশয়, বন্দর সৃষ্টি প্রভৃতি কাজ সুলভে এবং সুসংহত ভাবে করা যেতে পারে। নদীর স্রোত পরিবর্তন করতেও কেন্দ্রীন বিস্ফোরণকে কাজে লাগান যেতে পারে। যে কোন দেশই শান্তিপূর্ণ কেন্দ্রীন বিস্ফোরণকে প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা ভাবতে পারে।

সুতরাং সকলেরই উচিত কেন্দ্রীন শক্তির সাহায্যে মারাত্মক মারণাস্ত্র নির্মাণ না করে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা। ভারতের মতে, "The Civil Nuclear Powers can tolerate a nuclear weapon apartheid but not an atomic apartheid in their economic and peaceful development."

ভারত কর্তৃক কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ ও তার তাৎপর্য

Our atomic energy programme can now be said to have reached maturity and India can look forward to the period ahead as a developed and matured atomic power, but one whose efforts are solely directed towards using atomic energy for peace ful purposes .... India today is one of the half a dozen most advanced countries in atomic energy." — হোমি ভাবার কথাটির সার্থক রূপায়ণ ঘটল ১৮ই মে ১৯৭৪ সালে। ঐ দিন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভারতের মাটিতে প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটালেন। "কেন্দ্রীন ভারত" বা "Nuclear India" কথাটি নিছক কল্পনায় না থেকে বাস্তবে রূপান্তরিত হলো।

একটি দেশের পক্ষে তার প্রাথমিক প্রয়োজন হলো তার নিরাপত্তা রক্ষা করা। সুতরাং পারিপার্শ্বিকের সাথে সমতা রেখে নিরাপত্তার দাবীতে কেন্দ্রীন অস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলারের মতে, "We cannot have peace without strength. Real security and real peace can he better reached by developing our technical means including our nuclear explosives both for defence and for constructive peacetime purposes." — শক্তি ছাড়া আমরা শান্তি পেতে পরি না। প্রতিরক্ষা বা শান্তিপূর্ণ প্রয়োজনে কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ সমেত সকল রকম কারীগরি উন্নতি বিধান করেই প্রকৃত নিরাপত্তা, প্রকৃত শান্তি ভালভাবে আয়ত্ত করা যাবে।" কোন দেশ যদি আক্রান্ত হয় সর্বশক্তি দিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতেই হবে। ভারতীয় নেতারা বারে বারে একথাই বলেছেন যে ভারতের কেন্দ্রীন শক্তির সাহায্যে মারণাস্ত্র তৈরী করার কোন বাসনা নেই। এমনকি ১৮ই মে ১৯৭৪ সালে বিস্ফোরণ ঘটাবার পরও ভারতের নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি যদিও কেন্দ্রীন শক্তির সাহায্যে মারণাস্ত্র বানানোর ব্যাপারে ভারত যথেষ্ট সক্ষম।

এটাই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ভারত কতদিন মারণাস্ত্র তৈরী করার থেকে বিরত থাকার মনোভাব বজায় রাখতে পারবে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি যদি পরমাণু অস্ত্র তৈরী করতে শুরু করে সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে একেবারে নির্বাক দর্শক হয়ে থাকা মুশকিল। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি মিলিত ভাবে যদি পরমাণু অস্ত্র বর্জন চুক্তি করে তাহলেই কেবল ভারত তার পরমাণু অস্ত্র নির্মাণে বিরত থাকবে।

কেউ কেউ মনে করেন ভারত ১৯৭৪ সালে রাজস্থানে যে কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তার জন্য প্রয়োজনীয় বিভাজনশীল বস্তু পেয়েছে সিরাস রিয়েকটার থেকে। প্রথমে এই সিরাস রিয়েকটারের জ্বালানী সরবরাহ করেছে কানাডা। তারা এই শর্তে জ্বালানী সরবরাহ করেছিলেন যে এই জ্বালানী শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে হবে। এটা যদি সত্যিই হয় তবুও ভারত কোন ভাবেই চুক্তি লঙ্ঘন করেনি। কারণ ১৯৬৩ সালের পর থেকে এর পরিচালনার ভার সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে চলে এসেছে এবং তখন জ্বালানী ভারত নিজেই তৈরী করেছিল। এই বিস্ফোরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষায়, "an extension of our work of research and keeping abreast of developments in science and technology." শুধু যে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উন্নত পদক্ষেপমাত্র তা নয়, এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের পরিচিত রাখার উদাহরণ।"

এই বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে কি ভাবে কেন্দ্রীন শক্তিকে ব্যবহার করা যায় তা দেখা। কেবলমাত্র উন্নত দেশগুলিই আধুনিক প্রযুক্তির সব কিছু জানবে আর সব দেশ পেছিয়ে থাকবে তা কখনই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীন শক্তি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি যতই পরিণত হবে, ততই উন্নতশীল দেশগুলি কেন্দ্রীন শক্তিতে স্বনির্ভর হবে। এতে বিভিন্ন শক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে শক্তির সমতা আসবে।

ভারতের কেন্দ্রীন বিস্ফোরণের ঘটনা দেশে বিদেশে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছে। এই পরীক্ষা আবার সামরিক বাহিনীর মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। বিশ্বের মানুষ আজ শক্তি হিসাবে ভারতকে আর খাটো নজরে দেখতে পারবে না। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মাটির নীচে বিস্ফোরণ ঘটাতে অনেক বেশী সূক্ষ্ম কারিগরির প্রয়োজন। এদিকে থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের দাবী রাখেন।

শেষের কথা

এমন একটা সময় ছিল যখন কিছু কিছু বিদেশী বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে পরমাণু বা কেন্দ্রীন শক্তি ব্যবহারের ব্যাপারটি এতই সূক্ষ্ম এবং জটিল যে অনুন্নত দেশগুলি এর ব্যবহার করতে পারবে না। প্রথাগত জ্বালানী সঠিক ব্যবহার করতে শেখাটাই অনুন্নত দেশগুলির আগে দরকার। প্রথাগত জ্বালানী ব্যবহার করার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে রপ্ত করার পরই তারা পারমাণবিক শক্তির দিকে হাত বাড়াতে পারে। পরমাণু প্রযুক্তি অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে মরীচিকা মাত্র। এমনকি ১৯৬৮ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক একটি প্রতিবেদনে উন্নতশীল দেশগুলিকে পরমাণুশক্তি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করেছিল। এ ধরণের মানসিকতা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কেন না উন্নতিশীল দেশগুলি যদি পারমাণু শক্তি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থেকে যায় তাহলে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে শক্তির বৈষম্য বাড়তেই থাকবে।

ভারতের কেন্দ্রীন-শক্তি যুগের অন্যতম প্রবর্তক হোমি ভাবা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পরমাণুশক্তি উন্নতিকামী দেশগুলির অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে। কেন্দ্রীন প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারে বহু কাজ স্বল্পমূল্যে ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদন করা যাবে। কেন্দ্রীন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনুন্নত দেশগুলি পিছিয়ে পড়া ভাব কাটিয়ে উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারে।

কয়েকটি উন্নত দেশ কেন্দ্রীন শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তাদের আওতায় রেখে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় তাদের এ চেষ্টা সফল হয় নি। নিউক্লিয়ার প্রলিফারেশন চুক্তি সংক্ষেপে NPT এরকম একটি ব্যবস্থা যেখানে পরমাণু অস্ত্র তৈরী করার নামে অনুন্নত দেশগুলিকে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হয়েছিল। NPT-র বিপক্ষে ভারতের যুক্তি হলো (১) চুক্তিটি বৈষম্যমূলক কেননা এর সাহায্যে যাদের অস্ত্র নেই তাদেরকে আরও অস্ত্রহীন করা হবে। (২) যে সব দেশ শান্তিপূর্ণ কাজে কেন্দ্রীন শক্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে চলেছে তাদের কাজ পরিদর্শনের নামে তাদের কাজে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা হবে। (৩) উন্নত দেশগুলিই কেবল পরমাণু অস্ত্র তৈরী করার অধিকার বজায় রাখবে। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, "We seriously objct to it, we strongly resist any attempt at preventing

this country from making progress towards betterment and improvement of nuclear technology." "আমরা তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করি। কেন্দ্রীন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নতি বিধান করে দেশের অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী যে কোন প্রয়াসকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করব।"

ভারত কখনই কেন্দ্রীন প্রযুক্তিকে পরিত্যাগ করে শক্তিশালী দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারে না। নিজেদের অধিকার দাবী করতে ভারতকে "recalcitrate state" অর্থাৎ অবাধ্য রাষ্ট্র আখ্যা পেতে হয়েছিল শুধু তাই নয় ভারতকে নিরাপত্তার আশ্বাস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় ভারতকে নিরাপত্তার আশ্বাস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। চেষ্টা হয়েছিল যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে ভারতের কেন্দ্রীন প্রকল্পগুলিকে স্তব্ধ করে দেওয়া। NPT-তে যুক্ত হতে না চাওয়া এবং শান্তিপূর্ণ কেন্দ্রীন বিস্ফোরণ পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করে যে ভারত তার নিরাপত্তার ব্যাপার উদাসীন নয়। কিন্তু সে কখনই এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায় না যাতে সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে ভারত কখনই পেছিয়ে পড়তে চায় না। তার বিশ্বাস পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে নির্মূলকরেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষায়, "The problems of insecurity cannot be solved by imposing arbitrary restrictions on those who do not possess nuclear weapons without any corresponding steps to deal with the basic problem of limiting stockpiles in the hands of few Powers. How can the urge to acquire nuclear status be controlled so long as imbalance persists. "যাদের পরমাণু অস্ত্র নেই কেবলমাত্র তাদের ওপরে অহেতুক বাধানিষেধ আরোপ করে, কয়টি দেশ পরমাণু অস্ত্র সম্ভার বাড়িয়ে চলেছে। তাদেরকে নিবৃত্ত না করলে নিরাপত্তার অভাব দূর করা যাবে না। বৈষম্য থাকলে কেন্দ্রীন শক্তি আহরণের আকাঙ্খাকে সংহত করা যাবে না।"

সমস্ত বিশ্বের মানুষ যদি পরমাণু অস্ত্র পরিত্যাগ করে তবেই সব দেশের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব আসবে। অন্যথায় ভারতকে পরমাণু অস্ত্র তৈরী করে সামরিক শক্তি সুদৃঢ় করতে হবে। যদিও দ্ব্যর্থহীন ভাবে ভারত বিশ্বাস করে যে পরমাণু অস্ত্র সম্পূর্ণ বর্জনের মাধ্যমেই ধ্বংসের করাল ছায়ার হাত থেকে বিশ্ব মুক্তি পেতে পারে।

আজ পর্যন্ত যত আবিষ্কার মানুষ করেছে কেন্দ্রীন শক্তির আবিষ্কার তারমধ্যে সবচেয়ে বির্তকিত। হিরোসিমার কথা ভেবে আজও মানুষ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কেন্দ্রীন শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার যে সমৃদ্ধি ও প্রগতির উৎস হয়ে উঠতে পারে একথা তারা বিশ্বাস করতে চায় না। মানুষের কল্যাণে কেন্দ্রীন শক্তিকে কাজে লাগানোর সাধনায় ভারত আজ ব্রতী। ভাবার ভাষায়, – "Even if the wide spread use of atomic energy for peaceful purposes raised political and millitary problems there should be no option but to solve those problem."

"যদি শান্তিপূর্ণ কাজে কেন্দ্রীন শক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে গেলে রাজনৈতিক ও রণনীতি সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয় তাহলে সমস্যা সমাধান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।"

"কেন্দ্রীন ভারত" কথাটি পৃথিবীতে একটু ভুল বোঝা হয়। কেউ কেউ ভারতকে সন্দেহের চোখে দেখে। ব্যাক্তি বিশেষ যাই ভাবুক না কেন পৃথিবীর সামনে "কেন্দ্রীন

ভারতের" বাণী হলো নতুন শক্তির উৎসকে সংযমের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করা। বিশ্বের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় "কেন্দ্রীন ভারতে"র আত্মপ্রকাশ সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। আশা করা যায় ভারতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল দেশ পরমাণু অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে কেন্দ্রীন শক্তিকে মানুষের উন্নতি বিধানে কাজে লাগাবে। "There is no evil in atom, only in man's soul — it is really a test of souls". "পরমাণুর মধ্যে অশুভ কিছু থাকে না – অশুভ চিন্তা যা কিছু মানুষের মনে – মানুষের মন দ্বারা সব কিছু যাচাই হয়।"

মানুষ যদি তার ক্রোধ হিংসা পরিহার করতে পারে তবে অতি ক্ষুদ্র পরমাণু মানুষের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের ভান্ডার নিয়ে বসে আছে। ভারতই হয়ত একদিন মানব জাতিকে সেই সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে।

১৮ কেন্দ্রীন শক্তি ও বিজ্ঞানী

কেন্দ্রীন যুগের প্রত্যুষ

কেন্দ্রীন শক্তি পরিচালিত যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ না হলে হয়ত এ আবিষ্কার এত তরান্বিত হত না। এই শতাব্দীর শুরুতে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীনের গঠন ও কোন কোন অসুস্থিত পরমাণুর কথা সাধারণ ভাবে অনেকের জানা ছিল। শৃঙ্খল বিক্রিয়া বা সঙ্কটভরের ধারণার ওপর ভিত্তি করে অনেক কল্পকাহিনী গড়ে উঠেছিল। ১৯১৪ সালের আগে লেখা এইচ জি ওয়েলস তাঁর "The World set free" বইটি লেখেন। এই বইতে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে একধরণের বোমা একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করল।

ভরের শক্তিতে রূপান্তরের তাত্ত্বিক দিক সব বিজ্ঞানীরাই জানতেন। তবুও যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত এর ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে বেশী ভাবনা চিন্তা হয়নি। ১৯৩৮ সালে ডিসেম্বর মাসে অটো হ্যান ও ষ্ট্র্যাস মান বার্লিনে নিউট্রন দিয়ে আঘাত হেনে একটি পরমাণুকে ভেঙ্গে ভর শক্তিতে রূপান্তর হওয়ার ব্যাপারটাকে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক জোলিও কুরী দেখালেন যে, একটি ইউরেনিয়াম বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে একাধিক নিউট্রন বেড়িয়ে আসে। বিজ্ঞানীরা এরকম একটি আবিষ্কারের প্রত্যাশায় ছিলেন কেননা আমরা জানি এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়া চালানো সম্ভব, যাদেরকে শান্তিপূর্ণ কাজে বা অস্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। এই আবিষ্কারের পর তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন গবেষণাগারের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

আইনস্টাইন, জিলার্ড, ফের্মি, ভিগনার, টেলর প্রমুখ ইহুদী বিজ্ঞানীরা যুদ্ধের সময় হিটলারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ইউরোপ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নেন। এসব বিজ্ঞানীরা জার্মানীর পরমাণু বোমা তৈরীর কথা বলে আমেরিকাকে এব্যাপারে পরীক্ষানিরীক্ষা আরও জোরদার করতে বলেন। ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে ইউরেনিয়াম কমিটি গঠন করেন। যুদ্ধের পরে অবশ্য জানা গেল যে জার্মান সরকার পরমাণু বোমা বানাতে ততটা আগ্রহী ছিলেন না কারণ জার্মান বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম নিয়ে কাজ শুরু করলেও এ ব্যাপারে তারা বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাছাড়া প্রচলিত অস্ত্রের সাহায্যে তারা যুদ্ধে যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হিটলারের হাতে পরমাণু বোমা আছে বলে স্বয়ং আইনস্টাইন যে ভয় পেয়েছিলেন তার কোন তথ্যগত ভিত্তি ছিল না। বিজ্ঞানীদের ঐ অজ্ঞতা ও ভীতি পারমাণবিক শক্তিকে মারণাস্ত্র তৈরী করার কাজে প্রথম নিয়োজিত করেছিল।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে তত্ত্ব চালু আছে তাতে জানা যায় যে প্রায় পাঁচ বিলিয়ান বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল বিরাটকায় নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটে। এই সময়ই ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রীন বিশিষ্ট পরমাণু সৃষ্টি হয়। যারা অসুস্থিত তারা সেই সময় থেকেই লয় পেতে শুরু করেছে। তিনটি এধরণের অসুস্থিত বস্তু হলো - ইউরেনিয়াম ২৩৮, ইউরেনিয়াম

২৩৫ ও থোরিয়াম ২৩২। এদের অর্ধজীবন (Half life) কয়েক বিলিয়ন বছর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পৃথিবীতে অসুস্থিত কেন্দ্রীনরা উপস্থিত ছিল কিন্তু মানুষের নজরে এল এরা অতি আধুনিক কালে।

রুজভেল্টের পরমাণু বোমা বানাবার নীতির ফলে তথাকথিত ম্যানহাটন প্রকল্পের সৃষ্টি। এই প্রকল্পের মুখ্য পদার্থবিদ্ ছিলেন ওপেনহাইমার। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে হিটালারকে বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্য জার্মানিতে প্রথম পরমাণু বোমা ফেলা হবে। কিন্তু দেখা গেল বোমা তৈরীর আগেই ১৯৪৫ সালে জার্মানী যুদ্ধে হেরে গেল। ইতিমধ্যে পরমাণু বোমা তৈরীর কাজ আমেরিকাতে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এবার শুরু হলো বোমাটি পরীক্ষার সব ব্যবস্থা করা। প্রথম দিকে বিজ্ঞানীদের যে সব মানসিক বাধা ছিল প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও সামরিক চাপে তারা হারিয়ে গেল। হিটলারের মৃত্যু ও জার্মানীর আত্মসমর্পণ কিন্তু ম্যানহ্যাটন প্রকল্পকে বন্ধ করতে পারেনি। বোমা বিস্ফোরণ ও প্রযুক্তিগত সাফল্য অর্জনের উন্মাদনাই তখন সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই নিউমেক্সিকোর একটি জায়গায় প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষামূলক ভাবে ফাটানো হলো। হিসেব করে দেখা গেল বোমা ফাটার পর যে অগ্নিগোলক সৃষ্টি হয়েছিল তার তাপমাত্রা সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রার চার গুণ।

বিস্ফোরণের এই চেহারায় ওপেনহাইমার বিশেষ মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে তিনি গীতার একটি শ্লোক উল্লেখ করেন।

দিবি সূর্য সহস্রস্য ভাবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা সাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

আকাশে যদি সহস্র সূর্য একই সঙ্গে উদিত হয়, যদি সে রশ্মিচ্ছটার মতো কিছু থাকে সেই মহান পুরুষের দীপ্তি তারই সঙ্গে তুলনীয় হবে। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন আর ওপেন হাইমারের উপলব্ধির মধ্যে আদর্শগত তফাৎ থাকলেও দু'জনেই বিরাটত্বের মুখোমুখি হয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

পরমাণু বোমা কোন দেশের ওপর ব্যবহার করার ব্যাপারে ওপেনহাইমার সহ বহু বিজ্ঞানীর কিছু কিছু বক্তব্য ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন জনবিরল স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরমাণু বোমার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে নেওয়া হোক। এ ব্যাপারে তারা সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের মতামত গ্রাহ্য করা হয় নি। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাপানের বিরুদ্ধে বোমা ব্যাবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্তটি ছিল পুরোপুরি সামরিক। রাজনীতিকদের মনে হয়েছিল পরমাণু বোমা আর পাঁচটি মারণাস্ত্রের মতই এবং এর ব্যবহারের মধ্যে কোন নৈতিক বাধা থাকতে পারে না। যদিও তখন বোমা ফেলার সামরিক প্রয়োজন ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছিল কেন না আমেরিকার আক্রমণে জাপান ক্রমশঃ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র আমেরিকা তার শক্তি দেখাবার জন্য এবং নিজেকে বৃহত্তম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরমাণু বোমা ফেলা তরান্বিত করেছিল। যারা পরমাণু বোমা তৈরি করেছিল এবং ব্যবহার করেছিল তারাই তাদের নিজেদের সৃষ্ট 'ফাঁদে ধরা পড়ে গেল। এই ফাঁদটি হলো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি প্রতিযোগিতা।

জাপানীদের বিবরণ অনুযায়ী ৬ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালের সকাল ৮-১৫ মিনিটে হিরেসিমা

সহরে পরমাণু বোমা নিক্ষিপ্ত হলো। প্রথম পরমাণু বোমাটি ছিল ৩ মিটার লম্বা, ০.৭ মিটার চওড়া আর ওজন ৪ টন। ১৬ কিলোটন টি, এন, টির সমতুল $U^{২৩৫}$ ছিল। সেকেন্ডের মধ্যে সহরের ৪০ শতাংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, বাকী অংশ এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো যে তাদের চেনার উপায় রইল না। ২০০,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো। মৃত্যুর কারণ তাপ, আঘাত ও তেজস্ক্রিয়তা। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কে হিরোসিমার বোমা বর্ষনের কথা জানানো হলো তিনি বলেছিলেন "এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা"। পরে যখন তিনি ধ্বংসলীলার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন তখন তাঁর অভিমত পাল্টে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই রকম অভূতপূর্ব বিধ্বংসী একটি জিনিষ ব্যবহার করবার আদেশ দেওয়াটা মর্মন্তুদ ব্যাপার"। পরমাণু বোমা কেবল সামরিক অস্ত্র নয় – "অস্ত্রহীন মানুষদের নির্মূল করার উপায়ও বটে।"

যাই হোক না কেন সমরাস্ত্র তৈরীর বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়ে গেল। অহেতুক শক্তি প্রদর্শন করে যুদ্ধ জয় হল। যুদ্ধের সকল নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হলো। শান্তির নামে যা এলো তা হলো ঠান্ডা লড়াই। ১৯১4 সালে যে রাসায়ণিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯২৫ সালে, পরমাণু বোমার বিষময় পরিণতির কথা জেনেও কিন্তু সেরকম কোন নীতি এক্ষেত্রে নেওয়া গেল না। কিন্তু কোন বড় রাজনীতিক যদি পরমাণু বোমা বর্জনের নীতিটি গ্রহণ করতে পারতেন তবে হয়ত মানব সমাজের কল্যান হতো। যাইহোক ১৯৪৬ সালের জুন মাসে আমেরিকা ও বিভিন্ন দেশের পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার সকল ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধান করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি হলো। আমেরিকার প্রতিনিধির ভাষায়, "যতক্ষন না পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, ততক্ষণ আমেরিকা পরমাণু বোমা বন্ধ করবে না।" আমেরিকার এই প্রস্তাব সর্বসম্মত হলোনা। তিনবছর পর ১৯৪৯ সালের ২৯ শে আগষ্ট সোভিয়েট রাশিয়া তাদের পরমানু বোমা বিস্ফোরন ঘটালো। পরমাণু শক্তিতে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য দূর হলো। এর পর থেকে কেন্দ্রীন শক্তি চালিত অস্ত্র তৈরীর একটা অশুভ প্রতিযোগিতা মানব শক্তির শান্তির ও অস্তিত্বের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। পরমাণু বোমা তৈরীর ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা বিশেষ জানা যায় না। আমেরিকার সমতালে পাল্লা দেবার তাড়নায় তাদের সমস্ত যুক্তি তর্ক ভেসে গিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে গ্রোমিকো প্রস্তাব করেছিলেন মিলিত ভাবে পরমাণু বোমা তৈরীর প্রচেষ্টা বর্জন করা হোক এবং তিন মাসের মধ্যে সমস্ত পরমানু বোমা নষ্ট করে ফেলা হোক। আমেরিক এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি।

১৯৪৯ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার পরমাণু বোমা তৈরী ও পরে স্পুটনিক পাঠানোর ঘটনা আমেরিকাবাসীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করল। তাঁদের প্রতিজ্ঞা ছিল কেন্দ্রীন শক্তির ব্যাপারে সোভিয়েট রশিয়ার আগে থাকতে হবে। এরই ফলশ্রুতি হলো হাইড্রোজেন বোমা। বিভাজন প্রক্রিয়ায় যে তাপ বেড়িয়ে আসে তার সাহায্যে হাইড্রেজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করে ধ্বংসের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। হিরোসিমায় যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এ তার চেয়েও তীব্র। কিন্তু ওপেনহাইমার সমেত কিছু বিজ্ঞানী হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর বিরোধী ছিলেন। যিনি হাইড্রোজেন বোমা বানানোর পক্ষে ছিলেন তিনি হলেন এডওয়ার্ড টেলর। পাছে সোভিয়েট রাশিয়া আগেই হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করে সেই ভয়ে ট্রুম্যান হাইড্রোজেন বোমা তৈরী সমর্থন করেন। টেলরের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো। সোভিয়েট রাশিয়াও পেছিয়ে রইল না। মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সী বিজ্ঞানী শাখারভের নেতৃত্বে রাশিয়ার হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হলো।

বিটিশ হাইড্রোজেন বোমা ফাটাল ১৯৫৭ সালে। ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স ও চীনও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলো।

হাইড্রোজেন বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতার কোন সীমা নেই। এই অস্ত্রটি এখন পাঁচটি দেশের হাতে। যদি কোন দিন পরমাণু যুদ্ধ হয় তবে সমস্ত মানব সমাজ বিলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়াবে। ব্রাট্রান্ড রাসেল ও আইনস্টাইন ১৯৫৪ সালে যে আবেদন করেন তার মূল প্রস্তাব ছিল – মানব জাতি যুদ্ধ পরিহার করবে না নিঃশেষ হয়ে যাবে। যে সব যুদ্ধাস্ত্রের কথা আমরা জানি পরমাণু অস্ত্র সেরকম একটা অস্ত্র নয়। এর ব্যবহার মানব সভ্যতার বেশীর ভাগ অংশই ধ্বংস করে দেবে। যারা বেঁচে থাকবে দূষিত পরিবেশে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। একথা জানতেন বলেই পরমাণু বোমা বানানোর প্রসঙ্গে ওপেনহাইমার বলেছিলেন, "পদার্থবিদেরা পাপের সন্ধান পেয়েছেন"। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর হাত দুটি রক্তাক্ত। শাখারভও অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতে পরমাণু যুদ্ধ 'বিশ্বজনীন আত্মহত্যা'। এডওয়ার্ড টেলর অবশ্য অনুতাপ বোধ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন সীমিত পরমাণু যুদ্ধ, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে কেন্দ্রীন শক্তি সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় মানব জাতিকে ধ্বংস করতে পারে না। মাও সে তুঙের সঙ্গে তিনিও বিশ্বাস করতেন পরমাণু যুদ্ধের শেষে যারা বেঁচে থাকবে তারা তেজস্ক্রিয়তার ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠে সাহসী নতুন জগৎ সৃষ্টি করবে।

সৈনিক মন

সামরিক বাহিনীতে যারা কাজ করে কেবল তাদের মধ্যে নয়, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে একটি সৈনিক মন থাকে। নৈতিক বা আইনের কোন বাধা এই সৈনিক মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। সৈনিক মনের উচ্চাশা তার মনে এমন একটি প্রত্যাশার সৃষ্টি করে যা অন্য লোকের সুবিধা, অসুবিধা সম্বন্ধে অন্ধ করে দেয়। মহাত্মা গান্ধীর মতে মানুষের হাতে যখন অস্ত্র আসে তখন তার ব্যক্তিত্বই পালটে যায়। পালটে যায় বলতে মহাত্মা গান্ধী খারাপ দিকের কথাই ভেবে ছিলেন। ব্যক্তিত্বের এই পরিবর্তনই এক মানুষকে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে প্ররোচিত করে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নয় সামরিক প্রয়োজনীয়তা হলো সৈনিক মনের চূড়ান্ত নিয়ম।

বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলর "Pursuits of simplicity" নামে একটি বই রচনা করেন। সেখানে তিনি একটি পরমাণু যুদ্ধের সঙ্গে ১২১৯ সালে চেঙ্গিস খাঁর পার্শিয়া আক্রমণের তুলনা করেছিলেন। সেইযুদ্ধে লোকসংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ নিহত হন। বাকি ১০ ভাগের বেঁচে যাওয়াটা টেলরের মতে ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করতে যথেষ্ট। আক্ষরিক অর্থে হয়ত এ ধারণা ঠিক কিন্তু তিনি পরমাণু যুদ্ধের পর বেঁচে থাকা মানুষগুলির পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে মন দেননি। পরমাণু যুদ্ধের পর যাঁরা বেঁচে থাকবে তারা মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তার বিষবাষ্পে জর্জরিত হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে হিংস্র সংগ্রামে মত্ত হবে। তেজস্ক্রিয়তা ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে। ওপেনহাইমার এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে পরমাণু যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো মৃতদেহগুলি কবর দেবার মতন উপযুক্ত সংখ্যক লোক বেঁচে থাকবে কিনা। কানের মতে, 'পরমাণু যুদ্ধের পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা মৃতদের ঈর্ষা করবে। রোগজীর্ণ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ মানুষে আকীর্ণ পৃথিবীর কথা ভেবেও কিন্তু টেলর পরমাণু অস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলান নি।

তাঁর মতে যে যুদ্ধে একটি জাতির বিনাশ হয়ে যেতে পারে সেখানে আত্মরক্ষার জন্য পরমাণু বোমা ব্যবহার করায় কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

চেঙ্গিস খাঁ চেয়েছিলেন চোখের সামনে যাকে পাবেন তাকেই হত্যা করবেন। অবশ্য তাদের হাতে যে সব অস্ত্র ছিল তাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। কিন্তু পরমাণু অস্ত্রের ধ্বংস করার সীমাহীন ক্ষমতা আমাদের এই কথাই বলে যে মানবসমাজকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে সমস্যা দূর করার জন্য ও শান্তি রক্ষার জন্য আমাদের নতুন উপায়ের কথা ভাবতে হবে। এখন যুদ্ধাস্ত্র এমন অবস্থায় পৌছেছে যে একবার তা ব্যবহার করলে ভবিষ্যতের সব যুদ্ধের সম্ভবনা নির্মূল হয়ে যাবে। এখন হয় আমাদের যুদ্ধ পরিহার করতে হবে নয় পরমাণু অস্ত্র সব নষ্ট করে ফেলতে হবে। পরমাণু অস্ত্রের ভয় জিইয়ে রেখে ভীতি প্রদর্শনের সাহায্যে শান্তি স্থাপন করা যাবে না। যাই হোক পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার বর্জন করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে যত দেরী হবে ততই পরমাণু যুদ্ধের সম্ভব্যতা বাড়তে থাকবে।

পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার আমাদের এই সুন্দর প্রকৃতিকে মানুষ বাসের অযোগ্য করে তুলবে। ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রায় ১৪টি বিরাট সভ্যতা সামরিক কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এই সামরিক কারণেই হয়ত বর্তমান সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষ নামে জীবটি পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। সুতরাং পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের পেছনে যে যুক্তি খাড়া করা হয়েছে সে যুক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে সত্যিই পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োজন আছে কিনা? পরমাণু যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা অনুসন্ধান করতে গেলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

আমরা এমন একটা সমাজে বাস করি যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাস করেন। সব দেশ এখন আত্মরক্ষার অজুহাতে পরমাণু অস্ত্রের সম্ভার ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলেছে। অথচ সবাই দাবী করে যে তারা শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগাতে চায়। এই অবস্থায় একটি জাতি অপর একটি জাতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। ফলে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করার ইচ্ছায় পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠেছে। ফলে পৃথিবীর দুটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরু হয়েছে প্রত্যেক শক্তি আশংকা করছে যে অপর শক্তি হয়ত তাদের নিজস্বতা বিনষ্ট করে দেবে। এই দুটি শক্তিকেই প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব ছাড়তে হবে। প্রত্যেক শক্তির অন্তরের অন্তস্থল থেকে এই পরিবর্তন আসতে হবে। কাউকে বিনষ্ট বা পদানত করার বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে। এই পরিবর্তন হতে হবে স্বতঃপ্রণোদিত, শান্তিপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত। প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব সময়মত পরিহার না করাতে পৃথিবীর বহু সভ্যতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। নিজের ইচ্ছাকে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে গিয়েও বহু নেতার পতন ঘটেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সমস্ত মানব জাতির অস্তিত্বের বিষয়টি ভুলে গিয়ে সবাই জাতিগত সমস্যাকে বড় করে দেখছে। যে পরমাণু যুদ্ধ মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে তাকে ভয় না পেয়ে মানুষ ভয় পায় কমিউনিজম্ বা ধনতন্ত্রকে। হারম্যান কানের মতে, "Aside from ideological differences there did not seem to be any objective quarrel between the U.S.A. and U.S.S.R. that would justify the stupendous costs and risks undertaken in the arms and that the only thing that had to fear from each other was fear itself" — নীতিগত তফাৎ ছাড়া আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে এমন কোন বিভেদ নেই যার জন্য সমরাস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে এত ঝুঁকি নেওয়া ও এত অর্থব্যয় করা যেতে পারে। শুধু ভয় ছাড়া তাদের মধ্যে ভয় পাবার আর কিছু নেই।"

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হাইজেনবার্গ বলেন, 'ইতিহাসে এই প্রথম মানুষ তাঁর আপন সত্ত্বার মুখোমুখি হয়েছে – এই ছাড়া তার আর কোন শত্রু নেই।' 'For the first time in the History man on earth faces only himself and finds no other enemy.'

অহেতুক এই শঙ্কার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাটি আইস্টাইন ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে এতই বিচলিত করেছিল যে তাঁরা যুগ্মভাবে ১৯৫৫ সালের ৯ই জুলাই এক আবেদনে বললেন, 'আমরা আমাদের ঝগড়া ভুলতে পারিনা বলে কি মৃত্যুকে বেছে নেব, আমরা মানুষ হিসাবে মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি –' মানব জাতির কথা মনে রাখুন আর সব ভুলে যান — "shall we choose death because we cannot forget our quarrels ? We appeal as human beings to human beings — remember your humanity and forget the rest." মানুষের শত্রু হলো মানুষ। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার মধ্যে মানুষই বুদ্ধি বৃত্তিতে সবচেয়ে এগিয়ে। আদিম অবস্থা থেকে বুদ্ধির জোরে সে আজ বর্তমান সভ্যতায় এসেছে। কিন্তু তার চিন্তাধারা, মানসিক বৃত্তি গুলো আজও সেই আদিম অবস্থায় থেকে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষ আজ ধ্বংস করার কাজে লাগাতে চাইছে। মানুষ তারই স্বজাতিকে ধ্বংস করতে কমদামে সবচেয়ে বিধ্বংসী অস্ত্র আবিষ্কার করতে পেছপা নয়। নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী পাউলিং এর মতে কোবাল্ট বা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পর তা এতখানি তেজস্ক্রিয় কোবল্ট বা হাইড্রোজেন তৈরী করবে যা কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেবে।

ভয়, সন্দেহ, অহংকার, ক্ষমতালিপ্সা এগুলির প্রভাবে পৃথিবীতে কিছু দেশের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়েছে। অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করার চেষ্টায় মগ্ন। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রোমের মতে মানুষ যদি নিয়ত কেবলই ভয়ে ভয়ে দিন কাটায় তাহলে তার মন শক্ত হয়ে যায়। হৃদয় বৃত্তি গুলি নষ্ট হয়ে যায়। মানবিক মূল্যবোধ গুলো ক্রমশঃ হারিয়ে যায়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে, 'একটি দেশের নিরাপত্তার অধিকার যতই থাকুক না কেন কোন নৈতিক যুক্তিতেই সে তার অধিকার এমনভাবে প্রয়োগ করতে পারে না যাতে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার নিরপেক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এসব মানুষেরা কোন ঝগড়ায় অংশ নেয়নি। নিরপেক্ষ দেশগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রাথমিক অধিকারটুকু নিশ্চয়ই আছে এবং নীতিগত ভাবে তাদের পরমাণু যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। যদি পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি পরস্পরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়ে সারা মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তাহলে নিরপেক্ষ দেশগুলির অধিকার থাকবে এমন অস্ত্র তৈরী করা যা দিয়ে কেবলমাত্র রণোন্মত্ত দেশগুলিকেই ধ্বংস করা যাবে। ভয় আর সন্দেহ – মনের এ দুটি রোগকে বিতাড়িত করে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যাগুলির সমাধান না করলে মুক্তির সম্ভবনা নেই। এজন্য দুটি শক্তিগোষ্ঠির দায়িত্ব কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে।

কিন্তু এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যে দুটি শক্তি গোষ্ঠি তাদের রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে যে সংঘাত আছে তা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় ঠিক করে নেবে। বরং যে পরিমাণ মারণাস্ত্র তারা জমা করে চলেছেন তা তাদের পরস্পরের প্রতি রাজনৈতিক বিদ্বেষের তীব্রতাকেই প্রকাশ করে। আমরা আগেই বলেছি – প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা সৈনিক মন আছে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, ক্ষমতলিপ্সায় মানুষের মানবিক মনের ওপরে সৈনিক মনই কাজ করে। মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে সৈনিক মন সবসময় আক্রমণাত্মক,

স্বার্থপর, মূল্যবোধহীন, মিথ্যাবাদী ও অপরিণামদর্শী হয়। পরমাণু যুদ্ধের ব্যাপারে সৈনিক মনের প্রতিক্রিয়া একেবারে যান্ত্রিক, পরিণাম সম্বন্ধে একেবারে অনুভূতিশূন্য। যে কোন ভাবে দেশকে রক্ষা করার তাগিদই তাদের কাছে বড়। যেহেতু পরমাণু অস্ত্র খুশিমত ব্যবহার করা যায় এবং যেহেতু এইসব অস্ত্র চরম বিধ্বংসী সুতরাং সেই সব শক্তিধর দেশগুলির উচিত হবে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া। এমন ব্যবস্থা নেওয়া যাতে মানুষের মানবিক মন সৈনিক মনের ওপর আপন প্রভাব বিস্তার করে শান্তি ও স্থিতির আশাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনৈতিকতা

প্রায় অর্ধ বিলিয়ান বছর মানুষের ইতিহাস সোজা পথে চলেছে। মানব মস্তিষ্কের ক্ষমতা মোটামুটি ভাবে স্থির ছিল এবং মানুষের বুদ্ধি বিশেষ কয়েকটি আশ্চর্যকর জিনিষ আবিষ্কার করেছিল। এর পর অকস্মাৎ ভাগ্য পরিবর্তন ঘটল। অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে মানুষ উন্নতি করতে লাগল আগের সব আবিষ্কারকে পেছনে ফেলে। জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কৃত হলো, তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হলো। মানুষ অতলান্ত সাগরের গভীরে কিংবা বর্হিবিশ্বের মহাশূন্যতায় অক্লেশে যাতায়াত শুরু করল। উদ্ভাবিত হলো পরমাণু বা কেন্দ্রীন মারণাস্ত্র। এত অল্প সময়ে এতকিছু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে হয় প্রতিভাসম্পন্ন কিছু লোকের অনুপ্রাণিত বুদ্ধিবত্তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বিস্ময়কর জগতে উত্তরণ ঘটালো।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষে মানুষে যে সম্পর্কে তার কিন্তু বেশী উন্নতি হলো না। আদর্শের সংঘাত ঘটলে আজও একটি দেশ আরেকটি দেশকে শত্রু মনে করে। বিবাদ মেটানোর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগকেই আজও মানুষ উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে মনে করে। যুদ্ধাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চরিত্র কিন্তু বদলায়নি। তার ফলে এই শতাব্দীতে যুদ্ধ জিনিষটা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। পরমাণু যুদ্ধের আদিপর্বে মানুষের মধ্যে যে নৈতিকতা ছিল এতদিন পরে তার অবনতি ঘটেছে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে মানুষ মানুষকে ধ্বংস করেছে। এর জন্য তার কোন ধিক্কার বা ঘৃণা জন্মায়নি। প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে এমন ভাবে সাহায্য করেছে যাতে অত্যন্ত নিপুণভাবে অল্পসময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ একটি শহরকে বিনষ্ট করে দেওয়া যায়। দূর থেকে একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেবার একটা অনৈতিক প্রচেষ্টা সাড়া বিশ্ব জুড়ে চালানো হচ্ছে। পরমাণু যুদ্ধ ঘটলে সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে তা জেনেও মানুষ পরমাণু অস্ত্রনির্মাণে বিরত থাকছে না।

পরমাণু মারণাস্ত্রর আবিষ্কার তার সঙ্গে নিয়ে এসেছে উন্নত প্রযুক্তি বিশিষ্ট তীব্র যুদ্ধের সম্ভবনা। মানব জাতির ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ এমন অস্ত্র বানাতে চাইছে যা শত্রুপক্ষকে প্রত্যাঘাত করার কোন সুযোগ না দিয়ে তাকে ধ্বংস করবে। আব্রাহামলিঙ্কণ রাজনীতিতে যে নৈতিক প্রেরণা পেতেন তা আজ বিরাট সঙ্কটের মুখোমুখি। মানুষ বা বিজ্ঞান কেউই এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারবে না। মানবিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে যে রাজনৈতিক সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত দিকের সাহায্যে তার সমাধান করা যাবে না।

বিজ্ঞানের নতুন যাদুকরদের যদি নিবৃত্ত না করা যায় তাহলে হয়ত মানব জাতির ভবিষ্যৎ কমপিউটারের নির্ভুলতার ওপর নির্ভর করবে। যান্ত্রিক গোলযোগে যেমন যন্ত্রবিকল

হতে পারে ঠিক তেমনিভাবে মানুষের অসম্পূর্ণতার জন্য কমপিউটারও ভুল করে বসতে পারে। যাদের খুন করার প্রবণতা আছে অপরাধ আইনের সাহায্যে তাদের সংযত রাখা হয়। এই অবস্থায় তাদের জীবন যে দুর্বিষহ হয় না তার সরল কারণ হলো তাদের খুন করতে দেওয়া হচেছ না। খুব বেশী দেরী হওয়ার আগেই বিশ্বজনীন আইনের সাহায্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বেঁধে ফেলা দরকার। এর কারণ হলো পরমাণু অস্ত্র আবিষ্কার হবার পর সামরিক মতাদর্শ যা দাঁড়াচ্ছে তাতে অন্যভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যে সুবিধা পেয়েছি তাও হারাতে পারি।

স্বাভাবিক কৌতূহল বিজ্ঞানীদের বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করে সত্যকে খুঁজে পেতে অনুপ্রাণিত করে। বিজ্ঞান যে তথ্য যোগান দেয় তাকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই যমজ দুটি একাধারে আশীর্বাদ এ একাধারে অভিশাপ। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে নিজেদের আওতায় আমরা আনছি ঠিকই কিন্তু তার ব্যবহারের ওপর নির্ভর করছে সেটা ধ্বংস করবে না শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। সত্যানুসন্ধান ও জ্ঞান আহরণের জন্য বিজ্ঞানীরা কেবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে যান। পরিণামের কথা, তারা বিশেষ ভাবেন না কিন্তু দেশের নিরাপত্তার বা ব্যবসায়ের নামে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকৃত ব্যবহার করতে মানুষ ছাড়ে না। এতে বিজ্ঞান ক্রমশঃ রাজনীতিক বা ব্যবসায়ীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদেরও কোন সামাজিক সত্তা থাকে না। বিজ্ঞানের গবেষণা যদি মানবিক মূল্য বোধ সম্বন্ধে উদাসীন হয় তাহলে বিশ্বে ধ্বংস অনিবার্য।

বিজ্ঞানীরা সব দায়িত্ব রাজনীতিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্ত থাকতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এমনভাবে কাজ করে যেতে হবে যেন মানুষের পার্থিব ও আত্মিক উন্নতির সহায়ক হতে পারে। প্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞানের মধ্যে কোথায় যেন নীতিহীনতা আত্মগোপন করে আছে। তাই একটি আবিষ্কার সৃজনশীল না বিধ্বংসী তা নিয়ে তর্ক ওঠে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অজ্ঞতার বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম তার অঙ্গ। এই অজ্ঞানতা প্রকৃতির সম্বন্ধে, এই অজ্ঞতা মানব চরিত্র সম্বন্ধে। সকল অজ্ঞতা কাটানোই বিজ্ঞান সাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। মানুষে মানুষে বৈপরীত্যকে তীব্রতর না করে তাকে কমিয়ে আনার চেষ্টাতে বিজ্ঞান নিজেকে নিয়োজিত করবে। অনিবার্য ধ্বংসের কথা মনে রেখে মানুষ নিশ্চয়ই পরমাণু সমরাস্ত্রকে সমর্থন করবে না। এই সব মানুষের মধ্যে পরমাণু বিজ্ঞানী, ক্ষেপনাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিক সবাই আছে।

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্ উভয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অংশত দায়ী থাকবেন। বিজ্ঞানীরা তাঁদের আবিষ্কারের পরিণাম সম্বন্ধে সোচ্চার হবেন। যে বিজ্ঞানী পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যস্ত তাঁরা তাঁদের আবিষ্কারের পরিণাম জানেন না তা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের দোষ নয়। দোষ হচ্ছে বিজ্ঞানীর। কারণ ও প্রতিক্রিয়ার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তা বিজ্ঞানীরা অশ্রু বিসর্জ্জন করেও মোচন করতে পারবেন না। তাই কেবলমাত্র অস্ত্র তৈরী করার প্রযুক্তিতে অংশ না নিয়ে একজন বিজ্ঞানী তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

রাসেল-আইনস্টাইন যৌথ ঘোষণার কিয়দংশ
লন্ডন, ৯ই জুলাই, ১৯৫৫

যে বিয়োগান্ত পরিস্থিতি মানবসমাজকে গ্রাস করেছে তাতে আমরা মনে করি বিজ্ঞানীদের এক জায়গায় সমবেত হয়ে বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরীর ফলে যে বিপদের উৎপত্তি হয়েছে তার সম্বন্ধে সকলকে জানান। তাঁদের উচিত নীচের প্রস্তাবের মূলকথাটি আলোচনা করা।

আমরা এই কথাগুলি কোন একটি দেশ, জাতি বা গোষ্ঠির হয়ে কথা বলছি না। আমরা যার প্রতিনিধিত্ব করছি তা হলো মানুষ জাতি যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। পৃথিবীতে নানান রকমের বিবাদ বিসংবাদ আছে। কিন্তু কমিউনিজম্ ও অকমিউনিজমের মধ্যে বিবাদের পরিমাণ সবার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

কেউ যদি রাজনৈতিক ভাবে বেশী স্পর্শকাতর হন, যদি কোন বিষয়ে কারুর মতামত থাকে তবে আমরা তাকে বলব এ ধরণের মতামত দূরে সরিয়ে ভাবুন আমরা একটি প্রাণীজগতে বাস করি – এই প্রাণীটি হলো মানুষ। মানুষের একটি চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। এই মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাক তা আমরা চাই না।

আমরা এমন কথা একটা বলব না যা কেবল বিশেষ একটি গোষ্ঠিকে প্রভাবিত করতে পারে। আমরা প্রতিটি মানুষ একসঙ্গে আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। ধ্বংসের স্বরূপটি বুঝতে পারলে আশা করা যায় সমবেত ভাবেই আমরা আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেতে পারব।

আমাদের নতুন ভাবে ভাবতে হবে। কি করলে সামরিক ভাবে কোন গোষ্ঠি জয়লাভ করবে তা আর ভাবা চলবে না। যে প্রশ্ন আমাদের করতে হবে তা হলো ঃ কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যুদ্ধ পরিহার করা যাবে, যে যুদ্ধ সকলের ভাগ্যে দুর্যোগ ডেকে আনবে।

সাধারণ মানুষ বা কিছু উচ্চপদস্থ লোকও বুঝতে পারেনা পরমাণু যুদ্ধে মত্ত হলে কি ঘটবে। সাধারণ মানুষ আজও মনে করে এই যুদ্ধে কেবল কয়েকটি শহর ধ্বংস হবে মাত্র। এখন বোঝা গেছে যে পরমাণু বোমা রাসায়নিক বোমার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। একটি পরমাণু বোমা হিরোসিমাকে ধ্বংস করতে পারে একটি হাইড্রোজেন বোমা লন্ডন, নিউইয়র্ক বা মস্কোর মত বড় শহরকে নির্মূল করে দিতে পারে।

কোন সন্দেহ নেই যে হাইড্রোজেন বোমা বড় বড় শহরকে ধুলিসাৎ করে দিতে পারে। এটা কিন্তু ক্ষতির পুরো অংশ না। যদি কেবল লন্ডন, নিউইয়র্ক এবং মস্কো শহরের প্রতিটি লোক শেষ হয়ে যায় কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সে আঘাত সামলে উঠতে পারবে। কিন্তু আমরা জেনেছি পরমাণু বোমার প্রতিক্রিয়া স্থানীয় ব্যাপার নয়, ক্রমশঃ বিরাট জায়গা জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়বে।

কেউ জানেনা কতখানি জায়গা জুড়ে এই বিষময় তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সবাই একমত যে হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে যুদ্ধ হলে সমগ্র মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আশঙ্কা করা হয় যে হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে যুদ্ধ হলে বিশ্বজনীন মৃত্যু ঘটবে। স্বল্পসংখ্যক লোকের কাছে এ মৃত্যু আসবে চকিতে। বেশীর ভাগ লোক তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে।

মূলপ্রস্তাব

আমরা পৃথিবীর সব বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রস্তাব রাখছি :

"ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধ ঘটলে পরমাণু অস্ত্র নিশ্চিত ব্যবহার করা হবে ধরে নিয়ে এবং যে হেতু এধরণের অস্ত্র মানবজাতির অস্তিত্ব লোপ করে দিতে পারে তাই আমরা পৃথিবীর সকল শাসকদের একথা বুঝতে ও জনসমক্ষে ঘোষণা করতে বলছি যে যুদ্ধ দিয়ে তাদের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমরা তাঁদের অনুরোধ জানাব তাঁদের সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় খুঁজে বার করুন।

Max Born.
Percy W. Bridgman.
Albert Einstein.
Leopold Infeld.
Federic Jolio Curie
Herman J. Muller.
Linus Pauling.
Cecil F. Powel.
Joseph Rotblat.
Bertrand Russel.
Hide Ki Yukana.

১৯ কেন্দ্রীন শক্তির ইতিহাসের এক বিড়ম্বিত নায়ক

"All the world's a stage......"

Shakespeare.

১

আমরা সব সময় বিজ্ঞানীরা কি তৈরী করলেন তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকি কিন্তু তাদের জীবনের ব্যক্তিগত দিকটি আমাদের ভাবনা চিন্তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। যে পরমাণু বোমা তৈরী হল তা বিজ্ঞানীদের সৃষ্টি ঠিকই কিন্তু এই সৃষ্টির পেছনে রাজনৈতিক আর মানবিক লীলা প্রবহমান নদীর মত অবিরাম ঘটে চলে। কত কঠিন সাধনা, কত উত্থান পতন, কত উৎকণ্ঠা, কত আত্মতৃপ্তি, কত গ্লানি, কত সংশয়, যে একটি সৃষ্টির পেছনে থাকে তার কোন খবর আমরা রাখিনা। সৃষ্টির এক একটা ধাপের রোমাঞ্চ অনেক শ্বাসরুদ্ধ কাহিনীকে হার মানিয়ে দিতে পারে। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়েছে এই রকমই এক চমকপ্রদ নাটক যার কুশীলব হলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীরা। রাজনৈতিক প্রভাবে পরমাণুশক্তিকে বিধ্বংসী মারণাস্ত্রে রূপান্তরিত করতে গিয়ে তাঁদের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার সামনে পড়তে হয়েছে। পরমাণুবোমা তৈরী ব্যাপারে যে সব নায়কেরা রঙ্গমঞ্চে এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজনের জীবনের নাটকীয়তা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এই বিজ্ঞানীর জীবন বারে বারে মোড় নিয়েছে। বিশ দশকের কোন এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত ইংরাজী বৈজ্ঞানিক ডিরাক্ তাঁর এক সঙ্গীর সঙ্গে বৈকালিক ভ্রমণ করছিলেন। ডিরাক্ ছিলেন স্বল্পবাক্। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি তাঁর সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনতে পাই আপনি নাকি পদার্থবিদ্যার সাধনার সাথে সাথে কবিতা রচনা করেন ? পৃথিবীতে এই দুটি জিনিষ কি একসাথে করা সম্ভব ? বিজ্ঞানে আমরা সবকিছু এমনভাবে বলার চেষ্টা করি যাতে সবাই বুঝতে পারে; এমন জিনিষ বলার চেষ্টা করি যা মানুষ আগে জানত না। অথচ কবিতার বেলায় এসবের বিপরীতটাই ঘটে থাকে।' ডিরাকের সঙ্গে ভ্রমণরত বৈজ্ঞানিকটি ছিলেন ভবিষ্যত জীবনে আমেরিকাতে পরমাণুবোমা তৈরী করার ব্যাপারে সর্বেসর্বা আর আমাদের আলোচ্য নায়ক জোসেফ ওপেনহাইমার।

১৯৪৩ সালে জুলাই মাসে ওপেনহাইমার যখন লস্এলমোস গবেষণাগারের অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। অনেক মানুষের পক্ষেই এই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সেই হয়ত মানুষ জীবনের হিসেব নিকেশ করতে সুরু করে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যে বিচারকটি বসে থাকে তাকে প্রশ্ন করে – "যৌবনে আমি যা করতে চেয়েছি তার কতটুকু সম্পাদন করতে পেরেছি কতটুকু পারিনি।"

চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে ওপেনহাইমার যা যা করেছিলেন তা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকারই কথা। পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। সুদক্ষ ও সফল শিক্ষক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ন-এর কাছে ১৯২৭ সালে তিনি স্নাতোকত্তোর উপাধি পান। তখনই তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। কয়েক বছর পরে তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সব জায়গা ছেড়ে কেন তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন এই প্রশ্ন তাঁকে করাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "কয়েকটি বই-এর জন্য আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী কাব্যগ্রন্থের সংগ্রহ আমাকে মোহিত করেছে।" এই হলেন ওপেনহাইমার। একাধারে বৈজ্ঞানিক ও কবি।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় ওপেনহাইমারের প্রতিভা ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলল। একদিন তিনি বড় বড় বিজ্ঞানীদের যে শ্রদ্ধা দেখাতেন সেই শ্রদ্ধাই তিনি আর্কষণ করতে শুরু করলেন তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। ছাত্ররা তাঁর প্রতি এতই আকৃষ্ট হলো যে তারা সবাই তাঁর মুদ্রাদোষগুলি ইচ্ছাকৃত ভাবে নকল করতে শুরু করল। ঈষৎ মাথা হেলিয়ে কথা বলার অভ্যাস ছিল ওপেনহাইমারের। প্রতিটি বাক্য উচ্চারণ করে একটু কেশে বিরাম দিতেন।

একথা ঠিক যে রাদারফোর্ড, বর্ণ বা বোরের মত বিরাট আবিষ্কর্তা তিনি ছিলেন না বা কোন বৈপ্লবিক চিন্তার তিনি সূচনা করতে পারেনি। বিজ্ঞানের যে সব কাজ তিনি করেছিলেন তার মূল্যমান অনেক বড় হলেও তাদের ভিত্তি ভূমি ছিল অন্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। হাইজেনবার্গ, ডিরাক, ফের্মি প্রমুখ সমবয়স্ক বিজ্ঞানীদের মতন সাফল্যের শিখরে আরোহণ করতে না পারাতে তিনি সর্বদাই ম্রিয়মান থাকতেন। তাঁর কাজ গুণী লোকেদের সমাদর পেলেও তাঁর খুঁতখুঁতে মন তাতে সন্তুষ্ট ছিল না। বিরাট কিছু করতে পারেন নি – এরকম একটা প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ তাঁর মনকে সর্বদা ভারাক্রান্ত করে রাখত। মনের এরকম একটা অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটা কাজ করার সুযোগ পেলেন। সর্বকালের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রটি তৈরী করার কাজে নেতৃত্ব দেবার আহ্বান এলো তাঁর কাছে।

২

বোরের বক্তৃতা থেকে ইউরোনিয়াম বিভাজন ও তার থেকে বেড়িয়ে আসা বিরাট পরিমাণ শক্তির কথা ওপেনহাইমার জানতে পারেন। পরমাণু বোমা বানাবার কথাটি তখন থেকেই তাঁর মনে আসে। ১৯৩৯ সালে ওয়াশিংটনে এই বক্তৃতা দেন অধ্যাপক বোর। তাঁর বক্তৃতার একটি কপি চলে আসে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওপেনহাইমার সঙ্কটভর সংক্রান্ত গণনা সুরু করে দেন। এ ঘটনার ঠিক দুবছর পর 'ইউরেনিয়াম সমস্যা' সংক্রান্ত এক গোপন বৈঠকে তিনি সর্বপ্রথম আমন্ত্রিত হলেন। ১৯৪১ সালের শরৎকালে নোবেল পুরষ্কার জয়ী কম্পটনের অনুরোধে পরমাণু শক্তিকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য তৈরী বিশেষ কমিটিতে যোগ দেন ওপেনহাইমার।

এর পর ওপেনহাইমার শিক্ষকতার কাজে ফিরে আসেন যদিও তিনি জানতেন না এই নতুন যোগাযোগই ভবিষ্যতে তাঁর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষকতায় ফিরে এসেও তিনি তার মন থেকে ইউরেনিয়াম সমস্যার কথা তাড়াতে পারেন নি। নির্দিষ্ট কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাই তিনি গণনা করতে শুরু করেন ন্যূনতম কতখানি ইউরেনিয়াম হলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। ক্রমে ব্যক্তিগত উৎসাহে ওপেনহাইমার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়াম ল্যাবরেটরির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করলেন। এই ল্যাবরেটারির অধিকর্তা ছিলেন সাইক্লোট্রন

আবিষ্কর্তা ও নোবেল পুরষ্কার জয়ী লরেন্স। এই সময়ে গবেষণাগারে ইউরেনিয়াম ২৩৮ থেকে বিভাজনযোগ্য ইউরেনিয়াম ২৩৫ বার করার কাজ চলছিল। ওপেনহাইমার তাঁর দুজন ছাত্রের সহযোগিতায় এমন উপায় উদ্ভাবন করলেন যাতে সেই কাজে খরচের পরিমাণ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কমে যায়। কম্পটন ওপেনহাইমারের কাজে এতই সন্তুষ্ট হলেন যে ১৯৪২ সালে আমেরিকার পরমাণু বোমা তৈরীর প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানালেন।

পরমাণু বোমা তৈরী প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ওপেনহাইমার এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, আমেরিকা ছাড়া ইংল্যাণ্ড ও কানাডার যে সব বিজ্ঞানীরা এই ধরনের কাজে ব্যস্ত আছেন তাঁদের এক জায়গায় জড় করা দরকার। তিনি বললেন এমন একটি সংগঠন তৈরী করতে হবে যেখানে পদার্থবিদ্‌, গাণিতিক, ধাতুবিশারদ্‌, রসায়নবিদ্‌ ও অন্যান্য কলাকুশলীরা মিলিতভাবে কাজ করতে পারবেন। ওপেনহাইমারের প্রস্তাব সবাই অনুমোদন করল। প্রকল্পের প্রবক্তা হিসাবে ও নেতৃত্বে দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতার জন্য ওপেনহাইমারকেই যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচন করলেন কম্পটন। এই বোমার তৈরীর প্রকল্পটির নাম হলো ম্যানহাটন প্রকল্প। ১৯৪২ সালে সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক গ্রোভ্‌স্ ওপেনহাইমারের সঙ্গে সর্বপ্রথম মিলিত হলেন। ম্যানহাটন প্রকল্পের ব্যস্ত প্রধানের সময় বাঁচাবার জন্য স্থির হলো শিকাগো থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত একটি ট্রেন চলাচল করবে। বিলাসবহুল সেই ট্রেনের একটি সংরক্ষিত কামরায় সামরিক বাহিনীর লোকেরা ওপেনহাইমারের সঙ্গে মিলিত হবেন। ট্রেনের বদ্ধ কামরায় গাড়ীর চাকার বিরামহীন শব্দের মধ্যে নতুন গবেষণাগারের নক্সা তৈরী হলো, ঘোষিত হলো পরমাণু বোমার জন্ম লগ্ন। গভীর অন্ধকারের বুক চিড়ে যে ট্রেনটি সশব্দে চলে যেত তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাম হলো — "Twentieth Century Limited".

৩

পরমাণু বোমা সংক্রান্ত গবেষণাগারটি কোথায় স্থাপন করা হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। সামরিক কারণে এমন জায়গা নির্বাচন করা দরকার যা শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। নিউমেক্সিকোর লস্‌ এ্যালামোস শহরটির কথা মনে পড়ল ওপেনহাইমারের। তুলনামূলকভাবে জনবিরল জায়গাটিতে ওপেনহাইমারের ছেলেবেলা কেটেছে। ঠাট্টাছলে তিনি প্রায়ই বন্ধুদের বলতেন, "আমার দুটি ভালবাসার জিনিষ, এক পদার্থবিজ্ঞান, দুই নিউমেক্সিকো। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এদের আমি এক জায়গায় আনতে পারছি না।" তাঁর এই উপহাস একদিন বাস্তবে পরিণত হলো। নিউমেক্সিকো হয়ে উঠল পরমাণু গবেষণার পীঠস্থান। ১৯৪২ সালের ২৫শে নভেম্বর লস্‌ এ্যালামোস্‌ শহরটিকে সরকারী ভাবে অধিগ্রহণ করা হলো। শ্যামল বন প্রান্তর ঘেরা এই শান্ত শহরটি সরব হলো। ১৯৪৩ সাল থেকেই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীদের কাজ শুরু হয়ে গেল।

জেনারেল গ্রোভস ওপেনহাইমারকে গবেষণাগারের সর্বাধিনায়ক করার জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। তাঁর নিজের ভাষায় – "আমাকে তিরষ্কার করে বলা হতো যে কোন নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী এবং বয়স্ক লোককে এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল। আমি কিন্তু ওপেনহাইমারের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাঁর সাফল্যই প্রমাণ করেছে যে আমার ধারণা কত অভ্রান্ত ছিল। ওপেনহাইমার যা করেছেন তা আর কারুর পক্ষেই করা সম্ভব ছিল না।" ওপেনহাইমার তাঁর কাজে এত গভীর ভাবে নিজেকে

নিয়োজিত করেছিলেন যে জেনারেল গ্রোভস্ তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসকদের কাছ থেকে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি প্রথম জানাতে পারেন যে ওপেনহাইমার দীর্ঘদিন যক্ষ্মারোগে ভুগছেন।

কোথা থেকে জানা নেই, ওপেনহাইমার কিন্তু কাজ করার জন্য প্রচণ্ড শক্তি পেতেন। ট্রেনে এবং প্লেনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কৃতী বিজ্ঞানীদের তাঁর গবেষণাগারে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ইউরেনিয়াম প্রকল্প সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানীরই ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তাঁদের বোঝাতে গিয়ে ওপেনহাইমারকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই কাজে অনেক সময় তিনি তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে অবহেলা করেছেন। কখনও তিনি বিজ্ঞানীদের জার্মান পরমাণু বোমার ভয় দেখিয়েছেন কখনও বা লস্ এ্যালোমাসের সৌন্দর্য দিয়ে বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। ওপেনহাইমারের ব্যক্তিত্বের এক বিরাট আকর্ষণ ছিল। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে টেনে আনল। কাজের চেয়েও তাঁদের বড় আকর্ষণ ছিল ওপেনহাইমারের সান্নিধ্য। তিনি নীরস ভঙ্গিমায় কখনও কথা বলতেন না। কথায় কথায় তিনি দান্তে ও প্রাউস্টের উল্লেখ করতেন। অনেক ওজর আপত্তি কাটাতে তিনি ভারতীয় ঋষিদেরও টেনে আনতেন। তাঁর ক্ষীণ বহিরাবরণের আড়ালে এক বলিষ্ঠ ধর্মচেতনা হোমাগ্নির মত অহর্নিশি জ্বলত।

৪

গোপন পরমাণু প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে ওপেনহাইমারকে নিয়ম অনুযায়ী কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। এই সময় তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেছিলেন যে কয়েকটি বামপন্থী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগ ছিল। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজনীতিতে তাঁর আকর্ষণ জন্মায়। তাঁর পরিবারের কিছু লোক ও বন্ধু বান্ধব জার্মান বিপ্লবের বলী হন। তাঁর আগে তিনি নিজের বৈজ্ঞানিক কাজ কর্ম ছাড়া আর কিছু জানতেন না। এমন কি রেডিও শোনা বা কাগজ পড়াও তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।

স্পেনে গৃহবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ওপেনহাইমারের রাজনৈতিক চিন্তা নতুন মোড় নেয়।

এর পরেই তাঁর কমিউনিজমের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় ও রাশিয়া সম্বন্ধে নানান বই পড়তে শুরু করেন। এই সময়ে তিনি সমকালীন নানান বিষয়ের প্রবন্ধ রচনা করে নিজের খরচে ছাপতেন ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী বন্ধুদের সাহায্যে সেগুলি বিলি করতেন। বামপন্থী মনোভাবের জন্য ওপেনহাইমারকে সর্বদা নজরে রাখা হত। পরমাণু-বোমা তৈরীর গবেষণাগারের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তার লোকেরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত না। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর কোন সংযোগ আছে কিনা জানার জন্য গুপ্তচরেরা নিযুক্ত থাকত। ১৯৪৩ সালে ২৯শে জুন কর্নেল বোরিশ প্যাশ ওয়াশিংটনে সামরিক দপ্তরকে এক গোপন রিপোর্টে জানান যে তাঁর সন্দেহ ওপেনহাইমার পরমানু শক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি কমিউনিষ্টদের পাচার করে দিচ্ছেন, প্যাশ এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে ওপেনহাইমারকে বরখাস্ত করে দায়িত্ব ভার অন্য কাউকে দেওয়া উচিত।

প্যাশের এই রিপোর্টটি যখন জেনারেল গ্রোভসের হাতে গিয়ে পড়ল তখন তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি সংগে সংগে ওপেনহাইমারকে ডেকে পাঠালেন। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন এই আশ্বাস দিয়ে ওপেনহাইমার গ্রোভস্‌কে সন্তুষ্ট করলেন। প্রথমটা সন্দেহের দোলায় দুললেও গ্রোভস্ শেষ পর্যন্ত ওপেনহাইমারকে বিশ্বাস করলেন। গ্রোভস্ বুঝতে পেরেছিলেন যে ওপেনহাইমারের মতন বিজ্ঞানী ও সংগঠক ছাড়া তাঁর চলবে না। তাই তিনি সামরিক বিভাগকে চিঠি দিলেন ঃ–

War Department , office of the chief of Engineers.
Washington July 20,1943

Subject :— Julius Robert Openheimers.

To
The District Engineer, United State Engineer Office.
Manhattan District, Station F, New York, N.Y.

I. In accordance with my verbal directions of July 15, it is desrired that clearance be issued for the employment of Julius Robert Openheimer, without delay, irrespective of the information which you have concerning Mr. Openheimeir. He is absolutely essential for the project.

L. R. Brigadier General.
"CF."

গ্রোভসের এই চিঠি ওপেনহাইমারের অতীতকে একেবারে মুছে দিল। এজন্য তাঁর গ্রোভসের প্রতি কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি থাকার জন্য তিনি কোন ব্যাপারে সম্পূর্ন ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করার আগে ভালভাবে তার ফলাফল ভেবে নিতেন। কিন্তু গ্রোভসের সংগে আলোচনার পর তিনি স্থির করলেন দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর একটা আরামদায়ক অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদ তাঁর মনকে প্রশান্ত করল।

৫

১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসের শেষের দিকে ওপেনহাইমারকে একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর পূর্বতন একজন ছাত্রের নাম হলো রোলি লোমানিটজ। পরমানু বোমা বানাবার ব্যাপারে লোমানিটজ এর নৈতিক আপত্তি ছিল। ওপেনহাইমার অনেক বুঝিয়ে তাকে এ কাজে নামিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগসাজস্ থাকার অভিযোগে লোমানিটজকে বরখাস্ত করার উপক্রম হলো। ওপেনহাইমার নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেদের কাছে তাঁর ছাত্রের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। জেনারেল গ্রোভস তাঁকে সন্দেহ থেকে মুক্তি দিলেও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকের তাঁর সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না। তাই তাঁরা তাঁকে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কর্নেল প্যাশের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

কর্ণেল প্যাশ যখন ওপেনহাইমারের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন তখন তাঁর গতিবিধির ফিলম্ প্যাশের কাছে ছিল। শুধু তাই নয় সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করে রাখার জন্য ঘরে মাইক্রোফোন বসানো ছিল। ওপেনহাইমার অবশ্য এসব কিছুই জানতেন না। প্যাশ বারে বারেই জানবার চেষ্টা করলেন গুপ্তচরবৃত্তির কোন তথ্য ওপেনহাইমারের কাছে পাওয়া যায় কিনা। আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়ে প্যাশে তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার কর্ণেল ল্যান্সডেলকে তাঁর অভিমত হিসাবে লিখলেন :—

"This office is still of the opinion that Opoenheimer is not to be fully trusted and that his loyality to the nation is divided. It is believed that the undivided loyality that he can give is to the science and it is shortngly felt that if in his position the Soviet Government could offer more for the advancement of his scientific cause he would select the government as the one to which he would express his loyality."

"বর্তমান অফিস মনে করেন যে ওপেনহাইমারকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা ঠিক হবে না ! দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য দ্বিধান্বিত । কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আনুগত্য দ্বিধাহীন । সুতরাং একথা আমরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি যে যদি সোভিয়েট সরকার তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার জন্য বেশী খরচ করে তবে তিনি সেই সরকারের প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করবেন ।"

ওপেনহাইমারের সম্বন্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেদের ধারণা কিন্তু একেবারে অমূলক ছিল না । তিনি তাঁদের কাছে পুরো সত্য উদ্ঘাটন করেন নি । কিছু কথা তিনি গোপন রেখেছিলেন । কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর পূর্বতন সব যোগাযোগ ছিন্ন করেছিলেন সত্যি কিন্তু তিনি জানতেন যে নিরাপত্তাবাহিনীর লোকেরা তাঁর অতীত ইতিহাসের কথা জানতে পারলে তাঁকে কর্মচ্যুত করে আবার নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হবে । নিরাপত্তার লোকেরা কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না তাঁরা সম্পূর্ণ সত্য আবিষ্কার করতে চাইছিলেন । কিন্তু সেই সব সত্য ওপেনহাইমার প্রকাশ করতে চাইছিলেন না কারণ সত্য প্রকাশ পেলে তিনি আর ম্যানহাটন প্রকল্পের অধিকর্তা থাকতে পারতেন না । প্রকৃতপক্ষে সেইসময় কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আদান প্রদান করার অছিলায় পরমাণু বোমা সংক্রান্ত তথ্যাদি সোভিয়েট দেশে পাচার করতে চেয়েছিল । পরম ঘৃণাভরে তিনি এ ধরনের ঘৃণ্য ও অসংগত প্রস্তাব তীব্রভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কেন না তাঁর কথা সেটা হতো চরম দেশদ্রোহিতা ।

৬

সময় থেমে রইল না । ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে বেথে, টেলর, মরিসন ইত্যাদি-নামী-অনামী বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পরমাণু বোমা তৈরী হলো শেষ পর্যন্ত । সমস্ত বিশ্বকে সচকিত করে এই বোমা বর্ষিত হলো জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে । এক নিষ্করুণ ধ্বংসলীলা যেমন একদিকে হৃদয়কে মথিত করল তেমনি আরেকদিকে শোনা গেল যুদ্ধজয়ের আনন্দধ্বনি । দেশবাসীর আনন্দউল্লাস রবার্ট ওপেনহাইমারের হৃদয়ে সৃষ্টি করল গভীর এক বেদনা-সিক্ত বিষণ্ণতা । ওপেনহাইমার এতদিন কেবলমাত্র তাঁর সহকর্মী বন্ধুদের কাছেই পরিচিত ছিলেন । পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর সহসা তিনি দেশের সব সাধারণ মানুষের কাছে প্রশংসায় পাত্র হয়ে উঠলেন । পদার্থবিজ্ঞানী বিজয়ী বীরের সম্মান লাভ করল । সাধারণ মানুষ ভাবল ওপেনহাইমারের জন্যই তাদের দেশ শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং শুধু তাই নয় তাঁর আবিষ্কার ভবিষ্যতে সকল যুদ্ধের সম্ভবনাকে নির্মূল করে দেবে । কিন্তু ওপেনহাইমারের দৃষ্টির সামনে আশার আলো উদ্ভাসিত হয়নি কারণ তিনি এই আগাত শান্তির আশার মধ্যে অশান্তির সূচনা দেখতে পেলেন ।

ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে দুটি জটিল চিন্তাধারা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলত । প্রথমটি হলো যে, যে দুটি বোমা হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা হলো তা কোন একটি

ঘটনার শেষ পরিণতি নয়। অপর দিকে এই বোমা মারাত্মক অস্ত্র তৈরী করার প্রথম ধাপ যার শেষ ধাপটুকু কল্পনা করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় চিন্তাটি হলো সোভিয়েট ও আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে। সন্দেহের যে শ্যেন দৃষ্টি তাঁকে প্রতিপদে বিব্রত করেছে তাঁর থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সোভিয়েট ও আমেরিকা সাময়িক ভাবে মিত্র হলেও ভবিষ্যতে এই দুটি জাতি মারাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। এইজন্য পরমাণুশক্তিকে বোমা তৈরীর কাজে না ব্যবহার করার জন্য সমকালীন বিজ্ঞানীদের আবেদনে সাড়া দিতে পারে নি কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন তারা একাজে বিরত থাকলেও রাশিয়া মারণাস্ত্র তৈরী করবেই। ফলে বিজ্ঞানী মহলে তাঁর এতদিনের উজ্জ্বল ভাব মূর্ত্তি কিছুটা ম্লান হয়ে গেল। অনুভূতিপ্রবণ বিজ্ঞানী বিবেকের তাড়নায় ক্ষত বিক্ষত হলেন। প্রাণী বিজ্ঞানী থিওডোর হসচকা ওপেনহাইমারকে খোলা চিঠিতে লিখলেন, 'আপনারা গৌরবান্বিত কেন না আপনারা মৃত্যুর সুযোগ্য সহকারী।'

৭

১৯৪৫ সালে অক্টোবর মাসে ওপেনহাইমার লস্ এ্যালামাসের অধিকর্তা পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর পদত্যাগে বিজ্ঞানীরা অবাক হলেন কেন না তিনি কখনও পরমাণু বোমা বানানোর কাজকে বন্ধ করতে চান নি। এডওয়ার্ড টেলরের মত বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের এই আচরণকে অসংলগ্ন বলে আখ্যা দিলেন। জীবনের সুরুতে ওপেনহাইমার শিক্ষকতা করেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি তখন কৃতী বিজ্ঞানী, নিপুণ সংগঠক আর দক্ষ পরিচালক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাকক্ষে না গিয়ে তাঁকে বেশী যেতে হতো সরকারী ভবনগুলিতে। তিনি তখন কূটনীতিক ও নীতি নির্ধারক। এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনের এ এক নতুন অধ্যায়। তাঁর জীবনের এই পটপরিবর্তন কিন্তু বিজ্ঞানীরা ভালভাবে নিতে পারেন নি। তাঁদের অভিযোগ ছিল ওপেনহাইমার তাঁদের পথের সন্ধান দিয়েছেন কিন্তু তাকে পরিহার করার কোন পথ নির্দ্দেশ করেন নি। যে ওপেনহাইমারকে তাঁরা এতদিন তাঁদের আপনার ভেবে এসেছেন তাঁদের সে বিশ্বাসে ফাটল ধরল। উষ্ণ বন্ধুত্বের বাঁধন আর রইল না।

যখন ক্ষেপনাস্ত্র আর হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর কাজ চলছিল সে সময়ে ওপেনহাইমার ধীরে ধীরে তাঁর সরকারী প্রতিপত্তি হারাচ্ছিলেন, বিশেষ পরামর্শ দাতা' ছাড়া আর কোন পরিচয়ই তাঁর রইল না। কিন্তু আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলে ওপেনহাইমারের মানসিক শক্তির প্রশংসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পরমাণু জগত সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি সুযোগ্য পরিচালক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। লস্ এ্যালোমাস্ থেকে চলে যাবার পরও তিনি তাঁর নিজের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে তিনি বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। লোকেদের মোহিত করার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অভিযান সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞান নতুন নতুন ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে রোমাঞ্চ অনুভব করেন সেই রোমাঞ্চ তিনি সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন।

১৯৪৫ সাল থেকে তিনি বহু সম্মান বহু পদক পেয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁকে, 'মেডেল অফ মেরিট' দিয়ে সম্মান জানান। আমেরিকার যে কোন নাগরিকের পক্ষে এটা হল সবচেয়ে বড় সম্মান। উপাধি, মেডেল, উপহার যা কিছু তিনি পেতেন তা তিনি

সযত্নে রক্ষা করতেন এবং তারজন্য একজন সহকারী নিয়োজিত ছিল। এতসব পুরষ্কারের ভীড়ে বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগলেন।

১৯৫৩ সালের শীতকাল এলো। ওপেনহাইমারের মনে তখন প্রশান্তি। তাঁর মনে হলো কতৃপক্ষ তাঁর সম্বন্ধে যা সন্দেহ করতেন তার বোধহয় সমাপ্তি ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম ছিল। ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন কোনদিনই ওপেনহাইমার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। ১৯৫৩ সালে ওপেনহাইমার যখন ইংল্যাণ্ডে তখন নিরাপত্তা কতৃপক্ষ ওপেনহাইমার সম্পর্কির্ত সব ফাইল প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রেসিডেন্ট সপরিষদ বৈঠকে বসলেন, স্থির হলো সরকারী গোপন কথা ওপেনহাইমারকে কিছু জানানো হবে না। নিজের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসছে তা প্রিন্সটনে ফিরে এসে প্রথমে ওপেনহাইমার বুঝতে পারেনি। বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এই সময়ে ওয়াশিংটন থেকে তাঁর ডাক এলো। ২১ শে ডিসেম্বর তাঁকে পরমাণু কমিশনের বিশেষ পরামর্শদাতার পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলা হলো। কারণ হিসাবে বলা হলো যে কতৃপক্ষ মনে করে যে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ওপেনহাইমারের যোগসাজস্ আছে। হতচকিত ওপেনহাইমার যে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি পড়ে তবে তিনি তাঁর পরবর্তী কার্যপ্রণালী স্থির করবেন।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির কপি সরকারী ভাবে পেলেন। ইতিমধ্যে প্রিন্সটনে ওপেনহাইমারের ব্যবহৃত আলমারী থেকে সব কাগজপত্রগুলি সরিয়ে নেওয়া হলো। অন্যায় ভাবে সন্দেহ করে সৈনিকের চোখের সামনে তাঁর তরবারিটি ভেঙ্গে দিলে সৈনিকের মনে যে অবস্থা হয় ওপেনহাইমারের মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকমটি দাঁড়াল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করতে গিয়ে তাঁকে বহু নৈতিক বাধার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়েছে। এই সব নৈতিক বাধা কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে কখনও ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর এই দীর্ঘ দিনের দেশের প্রতি আনুগত্য কি একেবারে বৃথা ? তাঁকে বিস্মৃতির অতলে চিরতরে হারিয়ে যেতে হবে ?

ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ, তাঁর বিচারের কথা জনসাধারণ জানতে পারল ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে। এই সময়ই ওপেনহাইমারের এটর্নি ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ও তাঁর উত্তর নিউইয়র্ক টাইমস্‌ে প্রকাশ করলেন। ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে সরকারী নীতি জনমানসে গভীর দাগ কাটল। এর দুটো কারণ ছিল। প্রথমতঃ বিখ্যাত এই বিজ্ঞানী বহুদিন ধরে মানুষের কাছে পারমাণবিক যুগের পথিকৃৎ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বহু সমকালীন বিজ্ঞানী বিবেকতাড়িত এই সহযোগীর ভাগ্য পরিবর্তনে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। ওপেনহাইমার হাইড্রোজেন বোমা বানানোর ব্যাপারে আর্পত্তি জানিয়ে ছিলেন। হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হবার পর মানুষ যখন দেখল তার ধ্বংসলীলা আরও ব্যাপক তখন সারা পৃথিবীর শঙ্কিত মানুষ ওপেনহাইমারকে একমাত্র মরমী বিজ্ঞানী বলে মনে করল। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হবার আগেই পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি শহীদের সম্মান পেয়ে গেলেন।

ওপেনহাইমারের সঙ্গীরা একযোগে তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেন যদিও এই সমর্থন ব্যক্তিগত সহানুভূতি থেকে আসেনি। এর কারণ হলো সাধারণ মানুষ। সবকিছু না জেনে তাঁকে মানবতার পূজারী বলে ভাবত। ওপেনহাইমারের চরিত্রের অসম্পূর্ণতাগুলি তাঁর সঙ্গীরাই কেবল জানতেন। ওপেনহাইমারকে সমর্থন জানাবার পেছনের কারণ হলো তাদের নিজস্ব

স্বার্থ আর সহকর্মীকে সাহায্য করার স্বাভাবিক প্রেরণা। যে বিধিলিপি ওপেনহাইমারের জীবনে এলো তাতো তাঁর যে কোন সহকর্মীর জীবনে আসতে পারত। তাই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ইউরে বা প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী কনডনও ওপেনহাইমারের সঙ্গে সব ব্যাপারে একমত না হলেও তার দিকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিল।

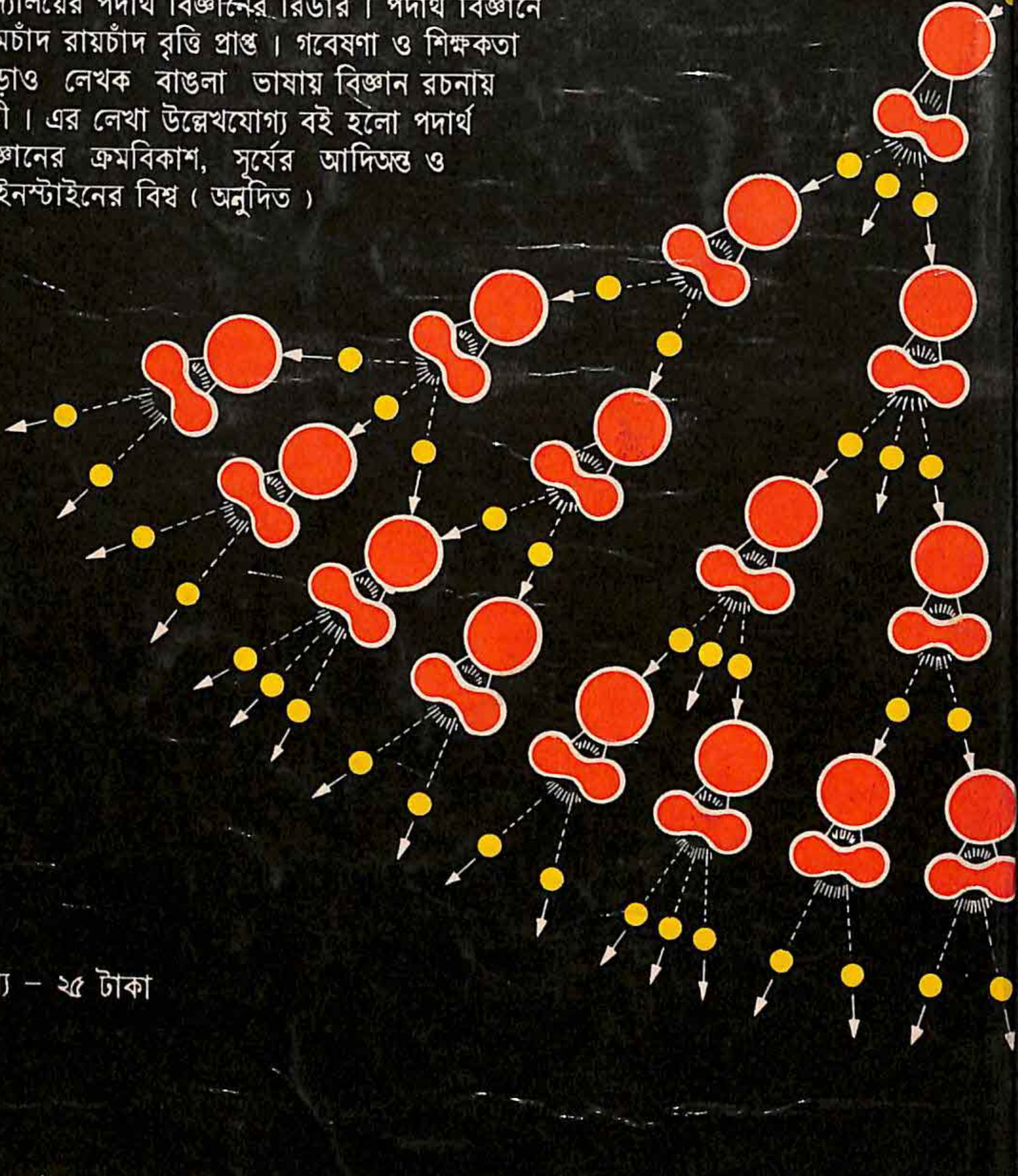
৮

ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে শুনানী সুরু হয় ১৯৫৪ সালের ১২ই এপ্রিল। পুরো তিন সপ্তাহ এই শুনানী চলেছিল। পরমাণু কমিশনের হয়ে সওয়াল করেন রোজার বোর। তাঁর দৃষ্টিতে ওপেনহাইমার ছিলেন দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী। তাঁকে দিনের পর দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। ওপেনহাইমার যে আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে তাঁর আশা, ভীতি, সাফল্য বা ভ্রান্তিকে তুলে ধরে ছিলেন তা বহুদিন মানুষ মনে রাখবে। তবে মাঝে মাঝে তিনি ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়েছেন, মনে হয়েছে শ্রোতাদের সম্মোহিত করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তিনি যেন হারিয়ে ফেলেছেন। ১৯৫৪ সালের ২২শে এপ্রিল ওপেনহাইমারের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলো। যে দিন একটি সফল মানুষের আনন্দমুখর দিন হতে পারত এমন একটি দিনে তাঁকে বিচারের মুখোমুখি হতে হলো। বিচারকরা সব ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে ওপেনহাইমার কেন্দ্রীন বিজ্ঞান যে সব ধর্মীয় সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার সমাধানে ব্রতী হলেন। তখন যারা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা সবাই বুঝতে পারতেন পরাজয়ের মানসিক দ্বন্দে তিনি ক্ষত বিক্ষত। এ সত্ত্বেও তাঁর সারা মুখে একটি প্রশান্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

ওপেনহাইমার পরমাণুশক্তির ইতিহাসে সবচেয়ে বিড়ম্বিত নায়ক। রাজনীতির টানাপোড়েনে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন না হওয়াতে তিনি হয়ত একটা ট্যাজিক চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। হ্যামলেটের মত তিনি ভেবেছিলেন পৃথিবীকে সঠিক পথ দেখবার জন্যই তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর এই মানসিকতা তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত, খানিকটা অস্থিরমতি করে তুলেছে। এই দ্বিধা বা অস্থিরতার সঙ্গে রাজনীতির প্রভাব যুক্ত হওয়ায় অনেক মূল্য দিয়েছেন তিনি। সবকিছু পেয়েও তাই এক বোবা কান্নায় মথিত হয়ে বেঁচে রইলেন বিজ্ঞানী জুলিয়েন রবর্ট ওপেনহাইমার।

রাজনীতি যে কি ভাবে জীবনের পট পরিবর্তন করাতে পারে ওপেনহাইমারের জীবন তার সাক্ষ্য। দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখেও নিজস্ব মতবাদ পোষণ করার অধিকার রাজনীতিকরা তাঁকে দেন নি। দেশের বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও সন্দেহের বিষদৃষ্টিতে তিনি জর্জরিত হয়েছেন। ওপেনহাইমারের জীবন একটি প্রতীকমাত্র। তাঁর অবস্থা কেন্দ্রীনশক্তি প্রকল্পে নিয়োজিত যে কোন বিজ্ঞানীর ভাগ্যেই নেমে আসতে পারে।

পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লীয়াসে যে শক্তি নিহিত আছে ব্যাপক অর্থে তাই হলো পরমাণু শক্তি। পরমাণুর কেন্দ্রীনে এই যে শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার প্রয়োগ বহুমুখী। তাকে ব্যবহার করা হয়েছে একদিকে সৃষ্টিশীল আর অপরদিকে ধ্বংসাত্মক কাজে। এই শক্তিরই এক সর্বাঙ্গীন রূপ আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের রিডার। পদার্থ বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত। গবেষণা ও শিক্ষকতা ছাড়াও লেখক বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় ব্রতী। এর লেখা উল্লেখযোগ্য বই হলো পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ, সূর্যের আদিঅন্ত ও আইনস্টাইনের বিশ্ব (অনূদিত)



মূল্য - ২৫ টাকা

বেস্টবুক্‌স্
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN 81-85252-18-1